সুবর্ণ সোপান

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের শ্রীমন্দির

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

সুবর্ণ সোপান

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সুবর্ণ সোপান

পরমহংসকুল - মুকুটমণি জগদ্গুরু
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী
মহারাজের ভক্তগণের সহিত ইংরাজী ভাষায়
কথোপকথন

(টেপে ধৃত ১৯৮১ এবং ১৯৮৫ সাল)

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ নং দমদম পার্ক, কলিকাতা - ৭০০ ০৫৫

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সুবর্ণ সোপান

প্রবক্তা -

পরমহংসকুলমুকুটমণি জগদ্‌গুরু

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য - সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ তথা শ্রীচৈতন্য-সারস্বত
কৃষ্ণানুশীলন সংঘের বর্ত্তমান সেবাইত ও আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য
ত্রিদণ্ডি-দেবগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের

কৃপানির্দ্দেশে

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ তথা শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘের
সহ-সম্পাদক
শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সংঘের পক্ষ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ।
৪৮৭ নং দমদম পার্ক, কলিকাতা - ৭০০ ০৫৫।

"দি গোল্ডেন্ ষ্টেয়ার্ কেস্" নামক পুস্তকের (ইংরাজী বক্তৃতার) সঙ্কলক ও প্রকাশক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ ত্রিদণ্ডী মহারাজ

আয়ার্ল্যাণ্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক

বাংলা মর্ম্মানুবাদ

শ্রীমতী দেবময়ী দাসী, কঙ্কর্ড, আমেরিকা।

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ

বঙ্গাব্দ - ১৪০১ শ্রীগৌর-পূর্ণিমা ইং ১৭।৩।১৯৯৫

শ্রীল গুরুমহারাজের আবির্ভাব শতবার্ষিকী

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ নং দমদম পার্ক,
কলিকাতা - ৭০০ ০৫৫
ফোন - ৫৫১-৯১৭৫।

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দশবিসা, পো ঃ গোবর্দ্ধন, মথুরা
উত্তর প্রদেশ।
ফোন ঃ (০৫৬৫)
৮১২১৯৫, ৮৫২১৯৫।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ,
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পিন নং ঃ ৭৪১৩০২
নবদ্বীপ, ফোন ঃ ৪০০৮৬।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
১৫ নং গ্লাডিং রোড্, মেনর্ পার্ক
লণ্ডন। ফোন ঃ (০৮১)- ৪৭৮২২৮৩।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, বিধবাশ্রম রোড্
গৌরবাটসাহি, পুরী, উড়িষ্যা
পিন নং ঃ ৭৫২০০১,
ফোন (০৬৭৫২) ২৩৪১৩।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সেবাশ্রম
২৯০০ নর্থ রোডিও গল্চ্ রোড্
সোকেল, ক্যালিফোর্নিয়া - ৯৫০৭৩
ফোন (৪০৮) ৪৬২-৪৭১২।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়,
উত্তর চব্বিশ পরগণা।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর মিশন
"শ্রীগোবিন্দধাম"
লট্ ২, বেল্টানা ড্রাইভ, টেরানোরা
এন্.এস্.ডব্লিউ। ২৪৮৬, অষ্ট্রেলিয়া।
ফোন (০০৬১) -৭৫-৯০৪৩৭১।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— প্রস্তাবনা —

যাঁহার ভুবন মঙ্গলময় দিব্য অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে পরমার্থ-পিপাসু ভাগ্যবান জীবগণ স্বরূপ-সম্পদ লাভের আশায় জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যে দলে দলে আসিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া নিজেদের ধন্য করিয়াছেন বা আজও করিয়া চলিয়াছেন সেই পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংসকুল মুকুটমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের বিশ্ব-প্রচারক জীবনের বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত প্রপন্নজীবগণের জীবনের অমৃতস্বরূপ কলিমলবিধ্বংসী হরিকথা টেপে ধৃত ছিল তাহার মধ্যে অনেকগুলি তাঁহারই শক্তি-সঞ্চারিত সেবকগণের দ্বারা ইতিপূর্ব্বেই নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় অপূর্ব্বসুন্দর গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশিত হইয়া আজও বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে পূজিত হইতেছে। বাকী টেপগুলিও ক্রমশঃ প্রকাশের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখিতেছি, তাহার মধ্যে আমাদের আয়ারল্যাণ্ডের আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত সুযোগ্য প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ ত্রিদণ্ডী মহারাজ ইতিমধ্যেই পারমার্থিক গ্রন্থপ্রকাশের মাধ্যমে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায় "দি গোল্ডেন্ ষ্টেয়ার্ কেস্" নামক গ্রন্থটির উনি-ই সঙ্কলক ও প্রকাশক।

উক্ত পুস্তিকা-টীও সর্ব্বত্র বিশেষভাবে সমাদৃত হওয়ায় আমাদের বিশেষ অনুরোধে বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞা পরমাভক্তিমতী মাননীয়া দেবময়ী দেবী দাসী উক্ত দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থরত্নটি সহজ ও সরল বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করিয়া দিয়া সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন ।

শ্রীল গুরুমহারাজের অপ্রকটের পর শ্রীমঠের ও তদনুগ সংঘাশ্রমগুলির বিবিধ সেবায় বিশেষতঃ বিশ্বব্যাপী শ্রীমঠাশ্রম ও সংঘবাসী সেবকগণের বিশেষ প্রচারোদ্যমে সামিল হইতে হওয়ায় বঙ্গভাষা ও হিন্দিভাষাভাষী সজ্জনগণের জন্য গ্রন্থ-প্রকাশ-সেবায় সামগ্রিকভাবে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই; তাই শ্রীল গুরুমহারাজের এই **শতবার্ষিকী মহামহোৎসব** বৎসরের বিশেষ সেবা উপলক্ষে সাধু-সজ্জনগণের তৃপ্তিবিধান তথা জীবকল্যাণের জন্য তাঁহার ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলির

বঙ্গানুবাদ ও অবশিষ্ট টেপ্‌গুলির প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়া বৃহৎ-মৃদঙ্গের মাধ্যমে পুস্তকাকারে প্রকাশ-সেবা-প্রচেষ্টা ও বিশ্বপ্রচারোদ্যম—এতদ্দ্বারা সার্থক হউক ও শ্রীগুরুদেব পরিতৃপ্ত হউন — ইহাই আমাদের তাঁহার অভয় পাদপদ্মে ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এতৎপ্রসঙ্গে যে সমস্ত পূজনীয় গুরুবর্গ ও স্নেহময় গুরুভ্রাতা ও স্নেহময়ী গুরুভগ্নীগণ তথা শ্রীভগবচ্চরণে নিবেদিতাত্ম সংঘের ও শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ যাঁহাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই মহদুদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে তাঁহাদের সকলেরই শ্রীচরণে আমি আমার দণ্ডবৎ প্রণাম ও নিষ্কপট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ছাপার ভুল ত্রুটী একেবারে পরিহার করা অসম্ভব। আশ্রমের পক্ষ হইতে একশত ষাট-পঁয়ষট্টিটি বই প্রকাশের পর এই ধারণাটাই ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হইতেছে। এমতাবস্থায় সহজ ক্ষমাশীল পবিত্র পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষাই আমার একমাত্র সম্বল।

পরিশেষে পরমার্থ পথের এই সমুজ্জ্বল "সুবর্ণ সোপান" দেশে দেশে গৃহে গৃহে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবনিশ্চয়কে জাগরিত করিয়া স্বীয় চিন্ময় আলোকপ্রভা বিকীরণ করিতে করিতে পারমার্থিক পথ-নির্দ্দেশে পরম কল্যাণ বিধান করুন — ইহাই আমার শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহনের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ
৪৮৭ নং দমদম পার্ক, কলিকাতা - ৭০০ ০৫৫

দীনাধম
শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ
ইং ১৭।৩।৯৫

সূচীপত্র

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী

মহারাজের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

চেতনার সাগরে তরঙ্গ আনে
সেবারত্ন মাণিক্য সম্ভার,
অপূর্ব্ব কৃপাভরে বিলিয়ে দিলে তার
অচিন্ত্য মণি-মুক্তাহার।।
তুমি সে সমুদ্র কিবা অনন্ত আকাশ প্রভু;
নক্ষত্র তোমার পদ-নখ জ্যোতিঃ-কণা,
ছায়াময় মর্ত্ত্য ভূমে কিবা সে জ্যোতিষ্কলোকে
কোনখানে নেই দেব তোমার তুলনা।।
অমৃত কুম্ভ আছে দুর্গম পর্ব্বতে
কৃপা করে কেউ দিলেন সন্ধান,
তুমিই দিয়েছ দিশা তাহার চেয়েও বেশী
রচিয়াছ সুবর্ণ সোপান।।

ইতি শ্রীচরণের অধম সেবিকা
দেবময়ী দাসী
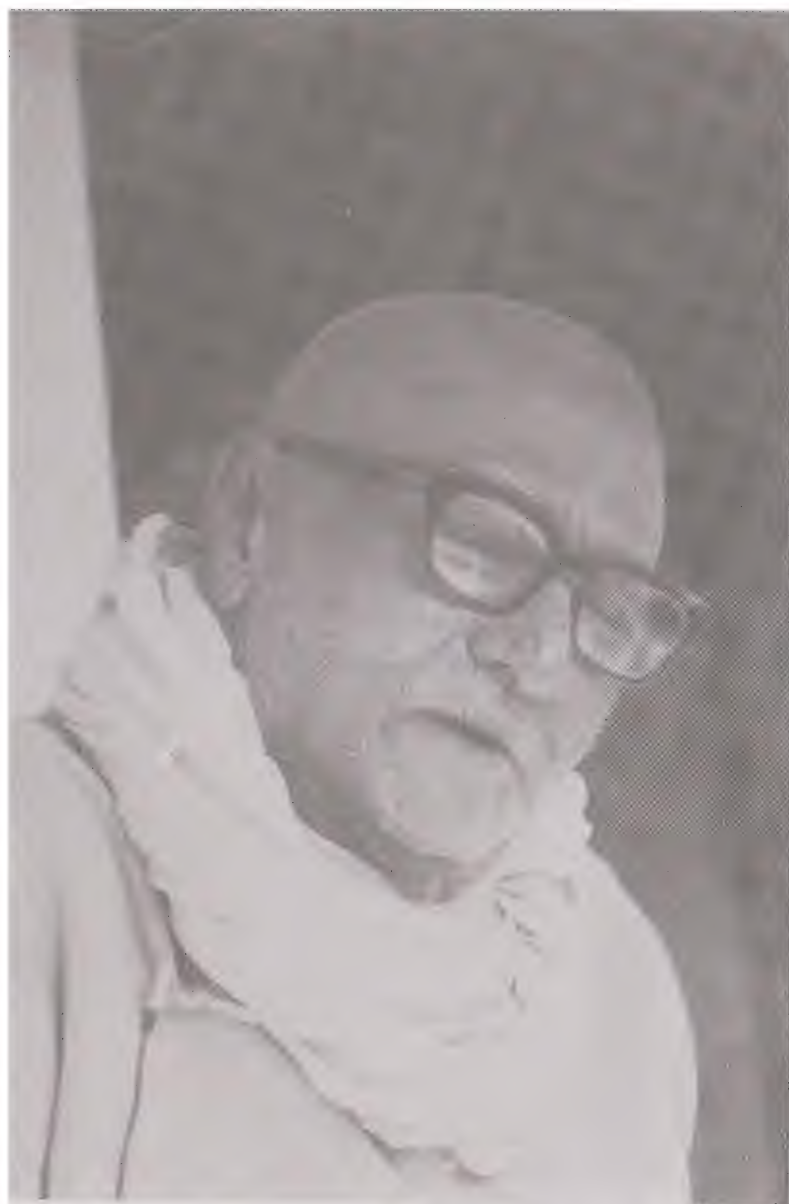
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
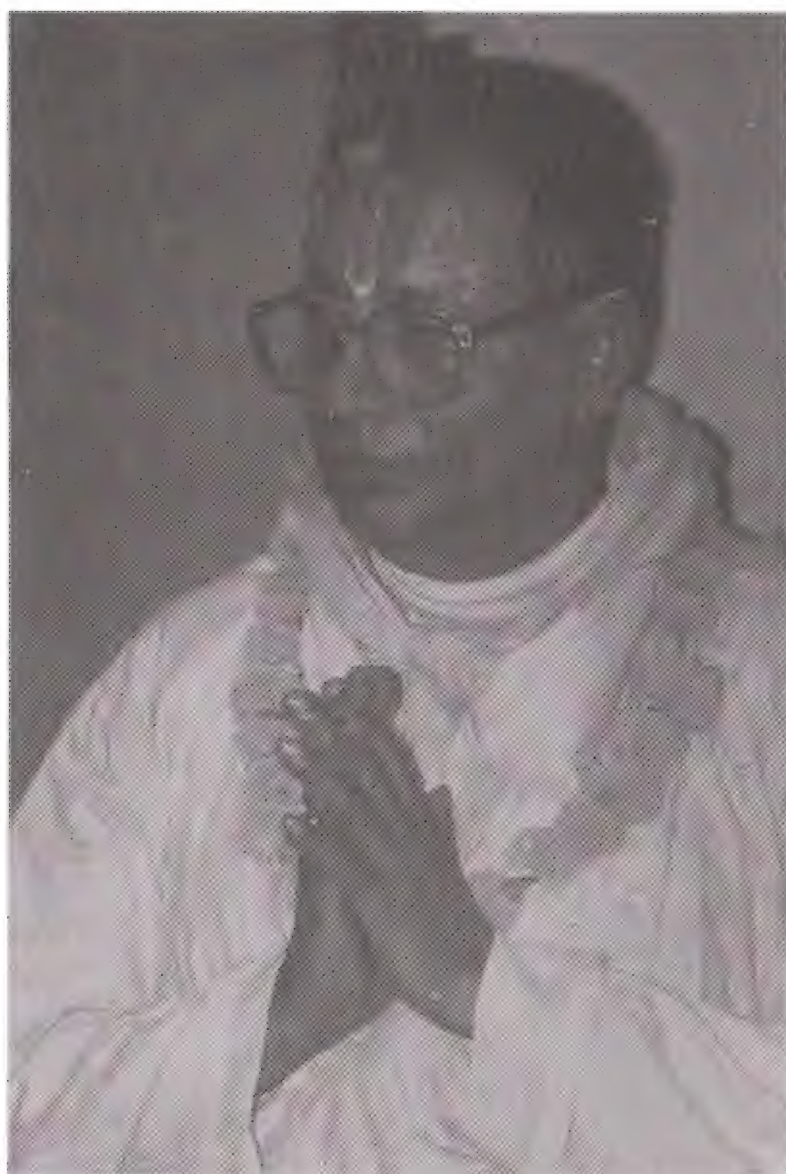
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীল গুরু মহারাজের জন্মশতবার্ষিক প্রারম্ভ উৎসব

শ্রী বৃন্দাবনে ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণ বল্লভজীর গৃহে

সুবর্ণ সোপান

প্রথম অধ্যায়

চেতন আকাশ

আদি বস্তু হল চেতন বা আত্মা। জড়বস্তু থেকে চেতন এসেছে একথা কখনই সত্য নয়, জড়বস্তু চেতনেরই এক অংশে অপাশ্রিতভাবে রয়েছে। চেতন হল অনন্ত আর সেই অনন্তের মধ্যে সবকিছুই রয়েছে। এই পৃথিবীতে কোথাও বরফ আছে, কোথাও শ্যাওলা আছে, কোথাও বা লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদি আছে — সেইরকম সবকিছুই সেই চেতন সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে — কত রকমের বিচিত্র ধারণা। কিন্তু মূলতঃ চেতনাই হল সবকিছুরই আশ্রয়। যেমন আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দেখা যায় অথবা হাওয়ায় সূক্ষ্ম ধূলিকণা, তেমনি জড়বস্তুর ধারণাও সেই চেতন আকাশেই রয়েছে। এও এক আকাশ কিন্তু চেতন আকাশ। আর সেই আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ও ধুলিকণার ন্যায় জড়ের ধারণাও ধৃত আছে। যেমন বাতাস আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু সেই বাতাসে ধূলিকণাও আছে। সেইরকম প্রকৃত যে আকাশ বা ব্যোম তাকেও আমরা দেখতে পাই না কিন্তু মেঘকে তো আকাশেই দেখি। সুতরাং পটভূমিতে আছে চেতনা আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই আছে কোথাও ধূলিকণা, কোথাও পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ইত্যাদি।

ডার্‌উইন্‌ এবং অন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী - গ্রহণার্থ প্রস্তাব দিয়েছেন — চেতন প্রথমে জড়বস্তু থেকেই জন্ম নিয়েছে। কিন্তু তাতে আমাদের উত্তর হল এই যে "ফসিল্‌ হল আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ" — ইহা অসম্ভব! এই ধারণাকে ধ্বংস করে সেখানে অনন্ত চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া উপায় নাই।" কেননা সবই চেতনময়, এই ফসিল্‌ তত্ত্বও সেই চেতনার স্তরেরই বহু ধারণার মধ্যে একটি।

চেতনা হচ্ছে পটভূমি — আর সেখানে যেমন বিকশিত চেতনা আছে, তেমনি আবার অন্য নানা অবস্থায় আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন প্রভৃতি নানা স্তরের চেতনাও আছে। ভূ, ভূর্বঃ, স্বর্‌, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য বা ব্রহ্মলোক -

এইসব বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন চেতনা আছে ; আর যদি সেখানে তার সঙ্গে সেবা-সম্পত্তি যুক্ত হয় সেখানে তা আরও উন্নত হয়। এক মাধুর্য্যময় সম্ভাবনার ভিত্তি তৈরী হতে থাকে সেই মুহূর্ত্ত থেকে যখন চেতনার মধ্যে সেবার ধারণা প্রবেশ করে। শুধু সেবা-বৃত্তি এক অপূর্ব সুন্দর গ্রাম, এক অপূর্ব সুন্দর নগর, এক অপূর্ব সুন্দর দেশ ও তার রাজধানী গড়ে তুলতে পারে। সেই দেশের অস্তিত্বও তার মধ্যেই রয়েছে , আমাদের শুধু তা অন্তরে অনুভব করতে হবে। সেই ভূমিকায় প্রবেশ করতে হবে, আর তারপর যে সেবা আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে বা হবে তা মাথায় তুলে নিতে হবে। তখন সেই নির্ম্মল সেবা ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত আমরা মনে করব "এই তো আমার ঘর। আর এই যে সেবা এতো আমার নিজের জিনিস, এতে আমার কত আনন্দ! এত দিনে আমি বাড়ী ফিরলাম।" এই হল আমাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা, অন্তর্নিহিত সত্ত্বা বা প্রকৃতি – এই হল আমাদের স্বরূপ, যা কিনা বর্ত্তমানে অজ্ঞতা আর ভ্রান্ত ধারণার নীচে চাপা পড়ে আছে। একজন পাগল সে তার সুখের ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ধারণা রাস্তায় রাস্তায় কাগজ বা কাপড়ের টুকরো কুড়িয়ে বেড়ানোটা তার খুব দরকার, এটা তার প্রাণধারণের অঙ্গ! কি অদ্ভুত ব্যাপার! তার মাথা এখন এমন একদিকে কাজ করছে যে সে ভাবছে "কাগজ কুড়িয়ে বেড়ানোটাই আমার কর্ত্তব্য।" এই ভাবে তার দিন কেটে যাচ্ছে। কিন্তু তার হৃদয়ে যে প্রকৃত সহজাত ঐশ্বর্য্য আছে –সেটা কি? যদি শুধু সে তার নিজের ঘরের কথা একবার মনে করতে পারত; যেখানে তার বাবা মা, পরিবার, আত্মীয় স্বজন সবাই আছেন – সেই সুখময়, আনন্দময় ঘরের কথা। কিন্তু তার পাগলামীর জন্য তার মন, তার সমস্ত চেতনা তাকে বাধ্য করেছে এক অদ্ভুত অর্থহীন জীবন কাটাতে। ঠিক সেইভাবেই বহু দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক নেতা ও আরও অনেকে ঐ একই অবস্থায় আছেন। তাঁদের সমস্ত চেতনা বর্হিমুখী হয়ে আছে আর তারা এই বর্হিম্মুখ জড়জগতে কিছু না কিছু সংগ্রহ করতে ব্যস্ত আছেন। পাগলের মত কেউ নুড়ি কুড়োচ্ছেন, কেউ কাপড়, কেউ কাগজ – তাঁদের সকলেরই এইভাবেই দিন কাটছে। স্বামী মহারাজ (শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ) বলেছিলেন, "এই ইউনাইটেড নেশন, এই ইউনেশকো – এইসব আর্ন্তজাতিক সংস্থা আর একদল কুকুর যারা এক জায়গায় হয়ে ঘেউ ঘেউ করছে – সবই সমান। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বসংস্থাগুলো বেশী ক্ষতিকারক। কারণ তারা বুদ্ধিজীবিদের পাকড়াও করে, কিন্তু চরমে তাদের অবদানের মূল্য ওই একই। তাঁরা এই জগতকে যে দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন তা তাঁদের নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা ও মায়ামোহের উপর প্রতিষ্ঠিত – যদিও তাঁরা নিজেদের খুব মহান্ বলে পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু যেমন একদল কুকুর কোন একটা জিনিস নিয়ে এটা আমার ওটা আমার করে কাড়াকাড়ি করে আর ঘেউ ঘেউ করে, তাঁরাও তেমনি কোন না কোন জড়বস্তুকেই খুব গুরুত্ব

দিচ্ছেন, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। প্রচন্ড সাহসের সঙ্গে স্বামী মহারাজ স্পষ্ট ভাষায় তাঁর এইসব অভিমত প্রকাশ করতেন। আর এই ধরণের চিন্তাধারাই আমাদের চেতনের দিকে কোন উচ্চতর সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অতীন্দ্রিয় ভাবনা

জনৈক বিদেশী ভক্ত: আজকাল খুব গরম পড়তে শুরু করেছে।

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ : তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানো উচিত নয়। এইসব জিনিস কেবল আসবে যাবে, আসবে আর যাবে। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় বলা হয়েছে,

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।১৪

অর্থাৎ "হে কৌন্তেয় ! ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে বিষয়ের সংযোগই শীতগ্রীষ্ম, সুখদুঃখ দান করে থাকে। কিন্তু তারা গমনাগমনশীল, অনিত্য। অতএব হে ভারত, তা সহ্য কর"।

শ্রীভগবৎ গীতার শ্লোক সম্বন্ধে একজন পণ্ডিত এই ব্যাখা দিয়েছেন যে এখানে এই সংস্কৃত "মাত্রা" শব্দটির অর্থ হল এই যে "যা ইন্দ্রিয় দিয়ে মেপে নেওয়া যায়" বা 'ইন্দ্রিয় যা মেপে নিয়েছে তার ফল।" এইভাবে মাত্রা শব্দ থেকে ম্যাটার্ (*matter*) শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে; এর অর্থ জড়বস্তু বা দৈহিক সুখের জগৎ। এই জগৎকে কত বিভিন্ন লোকে কত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে। একজন সাধারণ লোক এই জগৎকে যে চোখে দেখে, একজন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি তার থেকে ভিন্ন। সেইভাবে জ্যোতির্বিদ, রাজনীতিক, সমাজবিদ, মানবতাবিদ — সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গি হবে পৃথক পৃথক। কিন্তু যখনই আমরা আত্মার স্তরে আসব, তখন আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বা সম্বন্ধে সবচেয়ে নিম্নমানের ধারণাও আমাদের এমনভাবে সাহায্য করবে যে জীবনে তা- এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন আনবে। জগতের সবকিছুই তখন হবে অসার, অপদার্থ, জঞ্জালমাত্র।

আপাততঃ আমাদের আত্মা জাগতিক বহু জিনিস দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আছে যার ফলে তার চেতনানুভূতি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে। কিন্তু ভগবৎগীতায় এর সমাধান দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে কি করে ইন্দ্রিয়কে সংযত রেখে মনের বেগকে

দমন করা যায়। সেখানে এমন উপদেশ দেওয়া হয়েছে যা অনুসরণ করে আমরা ধাপে ধাপে উন্নত হয়ে চেতনের স্তরে আত্মার বাসভূমিতে পৌঁছতে পারব, সমস্ত নিম্নস্তর প্রবৃত্তি একে একে বর্জ্জিত হয়ে যাবে। প্রথমে যে স্তরকে অতিক্রম করে যেতে হবে তা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার স্তর, তারপর মনের স্তর, যার বেগ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কাজ করে, তারপর বুদ্ধিবৃত্তি, যা মানসিক প্রবৃত্তিকে চালিত করে, আর তারপর এইসব স্তরকে পেরিয়ে গিয়ে সেই আলোকবিন্দুকে খুঁজে নিতে হবে, যা হল আত্মা। যদি কোনক্রমে আত্মার অন্তর্দর্শনের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করা যায়, তাহলে এই জড়জগতকে আমরা যে মূল্য দিয়েছি তা নিতান্ত অকিঞ্চিতকর মনে হবে। তখন আমি বুঝব "যে আমার যে প্রকৃত স্বরূপ তা আমার ভেতরেই আছে, আর তা কি অপূর্ব, কি অমূল্য সম্পদ। আর এতদিন এই বাহ্য জগতের সংস্পর্শে থেকে যে সব অলীক অনুভূতি আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, তার থেকে কত স্বতন্ত্র। এই অন্দরমহলের এলাকা, এ কত সুন্দর, কত উন্নত আর এতদিন ধরে আমার চেতনা কত নীচুতে, কত জঘন্য জিনিসে মজে ছিল।" এই উপলব্ধিই এই জড়জগতের মোহকে দমন করার, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাকে দমন করার, ইন্দ্রিয়কে বশে রাখার সবচেয়ে বড় উপায়।

আশ্চর্য্য আত্মা

কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা – এই তিনটি জিনিস-ই আমাদের আত্মার চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই আমাদের ধাপে ধাপে উঠতে হবে – প্রথমে এই বাহ্য জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়ের জগৎ। সেখান থেকে মনের জগৎ, যেখানে ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করা হয়, তারপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকে যে চালনা করে – তার কাছে, সেখানে থেকে সেই চিন্ময় ভূমিকায় – আলোকের কাছে, যে আলোকের অস্তিত্ব আছে বলেই এসব সম্ভব হয়। সেই আলোক বিন্দুই হল আমার স্বরূপ, আমার সবচেয়ে কাছের জিনিস, সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। আর অন্য সবকিছু যেন নাছোড়বান্দা দালালের মত আমার পিছন পিছন ঘুরছে, আমাকে সেই জ্যোতির্ম্ময় কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নর্দ্দমার ঘোলা জলের মধ্যে ফেলবে বলে। এই জগৎকে ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করতে করতে যদি কখনও, কোনক্রমে একে আমরা সত্যিকারের মনোযোগ দিয়ে দেখি তখন অনেক কদর্য জিনিসই আমাদের চোখে পড়বে। তখন আমাদের মনে এমন কোন উপলব্ধি আসবে যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারব যে

আমাদের যে প্রকৃত স্বরূপ, সে আত্মা — এই সব কদর্য্যবস্তু কখনও তার আপন জিনিস নয়। শুধুমাত্র জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা তাদের গ্রহণ করি বলেই আমরা বিভ্রান্ত হই ও উদ্বেগ পাই — স্থূলভাবে বলতে গেলে অবস্থাটা এইরকম। তারপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তরের উপরে উঠলেই আমরা আত্মার বাসভূমিতে, এক অভিনব, অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ভূমিতে পৌঁছে যাব — আত্মা হল এমনই এক আশ্চর্য্য বস্তু।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন —
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।২৯

অর্থাৎ "কেউ কেউ জীবাত্মাকে আশ্চর্যবৎ দর্শন করেন, কেউ কেউ আশ্চর্য্য ভাবে বর্ণনা করেন, কেউ কেউ আশ্চর্য্য হয়ে সে বিষয়ে শ্রবণ করেন, আর কেউ কেউ শুনেও তাঁকে বুঝতে পারেন না"।

এইসব ধারণার উপলব্ধি হওয়ার পরেও আত্মাকে যথাযথভাবে বুঝে উঠতে পারা খুব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তবুও এটা বোঝা কঠিন নয় যে আমাদের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্য কত অমূল্য আর আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাটা কত জঘন্য।

সুতরাং এইটুকু অন্ততঃ আমাদের সততার সঙ্গে স্বীকার করা উচিত যে আমরা খুব জঘন্য অবস্থায় আছি। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ যা তা শুদ্ধ, কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থাটাই কদর্য্য। তবুও যেন তেন প্রকারেণ এইসব কদর্য্য জিনিসের মোহ আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে, কারণ এইসব কদর্য্য জিনিসের কামনা করা, তাদের সংগ্রহ করা, তাদের সঙ্গ করা এবং তাদের উপভোগ করা — এসবই আত্মার পক্ষে অসঙ্গত। যদি আমরা পরমাত্মার ভূমিতে প্রবেশ করতে পারি তখন দেখব যে জীবনের পরম সার্থকতা সেখানেই রয়েছে। যা কিছুকে বর্ত্তমানে আমরা বাস্তব বলে সত্যি বলে মনে করছি তা হল ঘৃণ্য, কদর্য্য জিনিস। আমাদের এ সংসারে "বাস্তববাদী" হতে বলা হয়েছে , কিন্তু যেখানে এজগৎটাই অবাস্তব সেখানে সাফল্য পেলে আমরা অবাস্তববাদী-ই হব।

জড়ীয় জ্ঞানের অসারত্ব–

শ্রীমদ্ভাগবতম্-এ বলা হয়েছে –

বেদং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১।১।২

অর্থাৎ "পরম সত্যকে যাঁরা বিশুদ্ধ হৃদয় তাঁরা বুঝতে পারেন। পরম সত্য হল বাস্তব বস্তু, তা মায়া মোহ থেকে ভিন্ন। সকলের কল্যাণকারী এই পরম সত্য ত্রিতাপজ্বালাকে উৎপাটন করে।" সুতরাং পরমসত্য হল বাস্তব বস্তু, এই জগতের সমস্ত অবাস্তব। কাল্পনিক বস্তুর ঊর্দ্ধে বাস্তবের অস্তিত্ব। আর এই জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত যত কিছু জ্ঞান আহরণ করা হয়েছে সে সবই অলীক বস্তু। এখানকার সব জ্ঞান-ই পারিপার্শ্বিককে ভুল বোঝার ফল, আর এই ভুলের ফসল ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত ধারণায় পরিপূর্ণ। তাই এই জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু – এর শব্দকোষ, এর ইতিহাস, এর মহাকাব্য যা কিছু সংগ্রহীত হয়েছে সে সবই সত্যের অপব্যাখ্যা আর তার মধ্যেই আমরা রয়েছি। সত্যের এই অপব্যাখ্যার জালে আমরা বন্দী হয়ে রয়েছি, তবুও সেই একই সঙ্গে প্রকৃত, নিত্য জীবনের পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার ক্ষমতাও আমাদের আছে, কেননা আমরা যে সেই চিন্ময় জগতেরই অংশবিশেষ। তাই আমাদের শ্রীভগবানের কাছে ফিরে যেতে হবে, নিজেদের গৃহে ফিরে যেতে হবে। এখানে আমাদের কি আর্কষণ থাকতে পারে? যেখানে আছে কেবল মৃত্যু, তারপর আবার জন্ম, যেখানে সবকিছু শুধু চর্ব্বিতচর্ব্বণ, যার থেকে আসে কেবল অবক্ষয় আর ক্লেশ। এখানে আমরা পাব কেবল নশ্বরতা, দুঃখ আর মৃত্যু, আর সেই শেষ নয়, তারপরেও নিরবধি কাল ধরে এখানে আসা যাওয়া করতে হবে- ওই একই অনিত্য, গতানুগতিক জীবনের পুনরাবৃত্তি করার জন্যে!

তাই আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে এর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে; শুধু তাই নয় অন্যদেরও সাহায্য করতে হবে, যাতে তাঁরাও তাঁদের সেবাময়, সুখময় প্রকৃত জীবন শুরু করতে পারেন – এই বাহ্যিক, অবাঞ্ছিত পারিপার্শ্বিক থেকে দূরে সরে গিয়ে । যেখানে সবকিছুই নিত্য, অমৃতময়, ও কল্পনাতীত সুন্দর, সেই শ্রীভগবানের দিব্য ধামে আমাদের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। শ্রীভগবান যেখানে আছেন সেখানেই আমাদের গৃহ – আমাদের সুখময়, শান্তিময়, পরম মধুর গৃহ। আমরা সেই গৃহেরই সন্তান। তাই শাস্ত্র আমাদের এই উপদেশ, এই প্রেরণা দিচ্ছেন "এখন যখন তুমি মনুষ্যজন্ম পেয়েছ, এই দুর্লভ সুযোগ পেয়েছ, তখন সবসময় চেষ্টা

কর, সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা কর। এসুযোগ হাতছাড়া কোরনা। চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, কথোপকথনের দ্বারা, শ্রবণের দ্বারা তোমার প্রকৃত স্বরূপকে বিকশিত কর, তোমার মহৎ স্বরূপকে খুঁজে নাও— তোমার নিজ বাসভূমিতে — আত্মভূমিকায় আত্মা যেখানে বাস করে।''

শ্রীভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া মানে নিজের গৃহেই ফিরে যাওয়া। এখন যা আমাদের কাছে রাত্রি, তাই তখন দিন হয়ে যাবে।এখন যেখানে অন্ধকার দেখছি তখন তা আলোকময় দেখব। অন্যদিকে এখন যা মনে হচ্ছে খুব সরল, খুব সহজবোধ্য, তাকেই আমাদের অবহেলা করতে হবে। সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এই সমগ্র শোষণ আর স্বার্থপরতার জগৎকে পদাঘাত করে অন্ধকারে ঠেলে দিতে হবে। এখানকার 'জ্ঞান' বা জড়বিদ্যা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে হবে। আর চেতনার যেখানে এখন অন্ধকার আছে — সেদিকে মনোযোগ দিয়ে, চিন্তাপূর্ণ আন্তরিক অভিনিবেশ দিয়ে সেখানে আলোক-কে প্রবেশ করতে দিতে হবে। সেই আশ্চর্য্য চিন্ময় জগৎ — যেখানে সবকিছুই আশ্চর্য্য, অভিনব, অপূর্ব্ব সুন্দর। সেখানকার বাসিন্দা হবার লালসাকে পালন করতে হবে।

চিন্ময় জগৎ বাস্তববস্তুপূর্ণ। এই জড় জগৎ সেই চিন্ময় জগতেরই প্রতিবিম্ব, তবে বিকৃত প্রতিবিম্ব। এখানেও প্রকৃতি আছে, তবে প্রকৃত বস্তু কেবল সেখানেই আছে, এখানে কেবল তার ছায়া আছে। ছায়ার মধ্যে কোন পদার্থ নেই, তার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই, সেই ছায়া যার থেকে এসেছে তাই প্রকৃত বস্তু। ছায়া এবং কায়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। কায়া-ই চিন্ময় বস্তু এবং উপনিষদে সেই চিন্ময় বস্তু সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতং ভবতি
যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বম্ ইদম্ প্রাপ্তম্ ভবতি।।

অর্থাৎ, '' যাকে জানলে সব কিছু জানা হয়ে যায়, যাকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়।''

চিন্ময় জগতের সম্বন্ধে এই ধারণা আমাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই ধারণা হলেই আমরা সেই জগতে প্রবেশ করতে পারব, আর সেখানকার সবকিছু আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে, না—তা নয়। সেখানে যাবার জন্যে একটা সুতীব্র লালসা, একটা সুগভীর আকাঙ্খাকে অন্তরে অনুভব করতে হবে,

সেই অনুভূতিকে উত্তরোত্তর বিকশিত করতে হবে। আর যতই তার থেকে তুষ্টি আসবে ততই তার জন্যে ব্যাকুলতা বাড়বে। সেই ব্যাকুলতার কখনও শেষ হবে না। এখানে, এই ছায়ার জগতেও আমরা কোনকিছুর 'শেষ' দেখি না; যদিও এ শুধু প্রতিবিম্ব মাত্র, তবুও এ এক চলমান, গতিশীল জগৎ। তাই আমাদের জন্যে আছে এক অনন্ত যাত্রা। কিন্তু ছায়ার জগতে যাত্রা আর কায়ার জগতে যাত্রার পার্থক্য হল সেখানেই। চিন্ময় জগৎ কখনও বিলুপ্ত বা অব্যক্ত হবে না, তার অস্তিত্ব সর্ব্বদাই থাকবে, সে নিত্য। সেইখানে আত্মা প্রকৃত বস্তুকে খুঁজে পায়। কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট হয় না, সে বলে "আমি আরও চাই।" প্রকৃত বস্তুর বা পরমসত্যের প্রকৃতিই হল এইরকম। আর শব্দ তাকে প্রকাশিত করেন।

এই জগতে শব্দ এক সূক্ষ্ম, দর্শনাতীত বস্তু, কিন্তু চিন্ময় জগতে তার বিপরীত। সেখানে শব্দ এক স্পষ্ট, মূর্ত্ত বস্তু। প্রতিবিম্বের অর্থই হল তাই যে তা সবসময় বিপরীত হবে। তাই প্রতিবিম্বতে ডান হাতটা বাঁ হাত হয়ে যায়, গাছের প্রতিবিম্বতে গাছের উপরিভাগটা নীচে দেখা যায়। সুতরাং সেই চিন্ময় বস্তুর জগতে শব্দ হ'লো সবচেয়ে মূর্ত জিনিষ। এখানকার সবচেয়ে সূক্ষ্ম সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অন্তরতর যে শব্দের ভূমি তা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহু আবরণ ভেদ করে সেই জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে — যে জগতের আবরণই হল শব্দ। সুতরাং শব্দের মাধ্যমে সেখানে আমরা যেতে পারি।

শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন,

> **প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধার্থমপেক্ষাম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততন্বেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি।"**

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৫৬ অনুচ্ছেদ

অর্থাৎ "সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত ভগবৎনাম শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয় মালিন্য থেকে মুক্ত হলে ভগবানের রূপসম্বন্ধী কথা শ্রবণ এবং তার ফলে অন্তরে ঐ রূপের উদয়হেতু যোগ্যতা লাভ হয়। রূপের কথা শ্রবণের প্রভাবে রূপের সম্যক্ উদয় হলে গুণের স্ফূর্তি হয়ে থাকে। গুণের সম্যক্ স্ফূর্তি পরিকরবর্গের সেবা-বৈচিত্র্য এবং তৎসহ তাঁর লীলাবৈশিষ্ট্য ও স্ফুরিত

হয়। এইভাবে তাঁর নাম রূপ গুণাদির স্মরণে তাঁর লীলা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয়ে সুন্দরভাবে স্ফুরিত হন।"

যদিও বর্ত্তমানে আমাদের আদি, নিত্য চেতনা থেকে আমরা দূরে সরে গেছি তবুও যখন আমরা জাগতিক বিষয়চিন্তা থেকে মুক্ত হবো, হৃদয় যখন শুদ্ধ হবে তখন শ্রীভগবানের দিব্যনাম বিদ্যুতের মত নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশিত করবেন। আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে শ্রীনাম এক অপূর্ব্ব রঙ ও রূপের উদয় করবেন, আমাদের চেতনার গভীরে এমন এক রং ও রূপকে আমরা পাবো – এ জগতের কোন রূপ ও রঙের সঙ্গে যার কোন তুলনা হয় না।

শব্দের আপেক্ষিকতা থেকে প্রথমে উদয় হবে রূপ ও রঙের, তারপরে গুণের উদয় হবে। এইভাবে এক থেকে অন্যের ক্রমবিকাশ হবে; সেই দিব্যনামের কোন দিব্যরূপ ও রঙ থাকবে আর সেই দিব্যরূপের কোন দিব্যগুণও থাকবে। সে সবই ক্রমশঃ অন্তরে প্রকাশিত হবে।

যত ব্যাকুলতার সঙ্গে শ্রীনাম উদিত হবেন, তাঁর গুণসমূহও সেই পরিমাণে উদিত হবে। গুণের পরে উদিত হবেন তাঁর পরিকরেরা। চিন্ময় জগৎ থেকে এসে এই রূপগুণপরিকরবৃন্দ আত্মার চেতনায় প্রবেশ করবেন। তারপর শুরু হবে নাম, রূপগুণ ও পরিকরবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময়, তাঁদের অন্তরঙ্গতার বিচিত্র তরঙ্গ — আর তাই হল 'লীলা'।

তখন জীবাত্মা দেখবে যে তার সবচেয়ে যে সূক্ষ্ম, শুদ্ধ সত্বা, যা তার প্রকৃত স্বরূপ, তার জন্যেও সেই লীলার মধ্যে কোন বিশেষ ভূমিকা আছে। সে নিজেকে সেই চিন্ময় জগতের একটি বিশেষ স্থলে একটি বিশেষ ভূমিকায় দেখবে। তখন তার এই দর্শন হবে যে "এই তো এই জায়গায়, ঠিক এইখানে আমি আছি, আমার প্রকৃত সত্ত্বা তো এখানেই আছে।" এইভাবে অনন্তের তরঙ্গ তার কাছে আসবে। এই ভাবে সেই চিন্ময় সেবা-ভূমিকায় সসীম জীব অসীমের সঙ্গলাভে ধন্য হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীগুরুপাদপদ্মদর্শন

জনৈক ভক্ত ঃ আমরা শুনেছি, গুরুশিষ্যের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শিষ্য এই জীবনে শুদ্ধভক্ত হবার প্রয়াস করে যদি সফল না হন তাহলে তাঁর গুরুদেব আবার এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে গুরুদেব স্বয়ংই আবার জন্ম নিয়ে আসবেন ?

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ : তাঁদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা অবশ্যই অব্যাহত থাকবে। কিন্তু শিষ্যের আগের জন্মে যিনি তাঁর গুরুদেবের ভূমিকায় আবির্ভূতহয়েছিলেন ঠিক তিনি স্বয়ংই আবার আসবেন কিনা – তাকেই আবার এই পৃথিবীতে পাঠানো হবে কিনা – সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু এটা ঠিকই যে শিষ্য তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন। তাঁর এই আত্মিক সম্পর্ককে তিনি ঠিকই চিনে নেবেন, যেমন তিনি পূর্ব্বেও এঁকে চিনে নিয়েছেন। যদিও এবার সেই চিরন্তন সম্পর্ক একটু অন্য রূপ ধরে আসতে পারে। কিন্তু তবুও তাঁর কাছে তা অজানা বা অচেনা থাকবে না। তিনি এটাও বুঝবেন যে "আমিও আমার প্রভুর কাছে অচেনা নই।" যদিও গুরুদেবের বাহ্যিক রূপ অন্য রকম হতে পারে।

ধরা যাক শিষ্যের কোন বিশেষ দেশে, কোন বিশেষ সমাজে জন্ম হবে। গুরুদেবও তেমনি কোন বিশেষ দেশে, বিশেষ সমাজে আর্বির্ভূত হবেন। শিষ্য যে আগে যে অবস্থায় এসেছিলেন, এবারেও সেইভাবেই আসবেন তার কোন ঠিক নেই; আবার গুরুদেবও যে পূর্ব্বে যে ভাবে এসেছিলেন এবারেও সেইভাবেই আসবেন তার কোন ঠিক নেই। তবুও তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে চিনে নেবেন। গুরুদেব তাঁর শিষ্যের পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে জানবেন, শিষ্যেরও মনে হবে "ইনি আমার সম্পর্কে সবকিছু জানেন।" এই ধরণের উন্নত দৃষ্টি নিয়ে আমাদের শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করতে হবে। সুতরাং গুরুতত্ত্বের অর্থ হল "সাক্ষাদ্ হরিত্বেন"। শ্রীগুরুদেব, তিনি শুধু একজন নন, তিনি একজনের চেয়েও বেশী, তাঁর ভিতর আরও কিছু আছে। আর শ্রীগুরুদেবকে এইভাবে পাঠিয়েছেন শ্রীভগবান স্বয়ং বা তাঁর স্বরূপ শক্তি। বাহ্যিক পরিবেশ যাই হোক না কেন, শিষ্যের ভক্তি পথে কোন বাধা থাকবে না।

জনৈক ভক্ত : আমি জানি না একথা সত্যি কি না, তবে আমি শুনেছি যে শিষ্য যতক্ষণ না তাঁর ভজনজীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করবেন ততক্ষণ তাঁর গুরুদেব শ্রীভগবানের দিব্য ধামে ফিরে যাবেন না। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই থেকে যাবেন, শিষ্যকে সঙ্গে না দিয়ে তিনি কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবেন না।

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ : তা যদি সত্যি হয় তাহলে কোন গুরুই কোন সময় কৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে পারবেন না। কারণ তাঁর শিষ্যেরা তো ক্রমাগত আসতেই থাকবেন, আর কোন বিশেষ সময়েই তাঁরা সকলেই একসঙ্গে তাঁদের ভজন জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করবেন না। সেইরকমের একটা চরম বা অন্তিম সাফল্য গুরুদেবের জীবনে কখনই আসবে না। কিন্তু আমরা ভাবতে পারি না যে গুরুদেব কৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে পারবেন না — একথাটা অন্যভাবে সত্যি হতেপারে। অনেক সময় সেই গুরুদেব নিজেই শ্রীভগবানের প্রতিনিধি রূপে আসবেন, আবার অনেক সময় অন্য কেউও শ্রীভগবানের প্রতিনিধি হয়ে আমার গুরুদেব হয়ে আসতে পারেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব অন্তরঙ্গ শিক্ষা ও উপদেশ, তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অনুভূতি, এসব জিনিস এমনভাবে শিষ্যের কাছে প্রকাশিত হবে যে শিষ্যের কোন বিভ্রান্তি হবে না। সরকারী কর্ম্মচারীর বদল হতে পারে, কিন্তু সরকারের কাজকর্ম্ম চলতেই থাকবে। সুতরাং গুরুদেব স্বয়ং ফিরে আসতেও পারেন নাও আসতে পারেন। নামগুরু, মন্ত্রগুরু, সন্ন্যাসগুরু, সকলেই গুরু। তাঁদের সকলের মধ্যে কোন একতাকে, কোন অভিন্নতাকে আমাদের চিনে নিতে হবে। তাই শাস্ত্র আমাদের গুরুদেবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন, "সাক্ষাৎ হরিত্বেন"। কৃষ্ণ বলেছেন ":আমি নিজেই গুরুদেব হয়ে আসি অতএব তিনি একই সঙ্গে অচিন্ত্যভাবে ভিন্ন ও অভিন্ন।" কৃষ্ণ বলছেন, "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"। তুমি গুরুদেবের মধ্যে আমাকে দেখ, আমিই তোমার গুরুদেব। আমার বিভিন্ন শক্তি দ্বারা অথবা কোন জীবাত্মাকে আমার প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে বা যে কোন উপায়ে তোমাকে চিন্ময় জগতে নিয়ে যাওয়াটা আমারই কাজ। সবক্ষেত্রেই আমিই আছি। আমি আমার মধুর রসের শক্তিতে বা সখ্যরসের শক্তিতে, বাৎসল্য রসের শক্তিতে বা দাস্য রসের শক্তিতে বা শুধু আমার সর্ব্বদা দর্শনীয় রূপেও আছি।"

এমনও হতে পারে যে কোন জীবাত্মা এখন হয়ত রামানুজ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেছেন, আবার পরবর্ত্তী কালে তিনিই হয়ত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশ করবেন। কিন্তু এসবের মধ্যে যে নিত্য চিরন্তন যোগাযোগটা আমাদের মধ্যে রয়েছে, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

জনৈক ভক্ত: তাহলে কি বুঝতে হবে যে যদি কেউ বলেন "গুরুদেব স্বয়ংই আবার ফিরে আসবেন" সেটা একটা জাগতিক ধারণা, একটা ভুল ধারণা?

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ : হ্যাঁ তাই। মূল সূত্র বা যোগাযোগটা ঠিকই থাকবে, কিন্তু সেটা যে সবসময়ে একই রূপ নিয়ে আসবে তা নয়। যদিও একজন নতুন ভক্তের কাছে কেউ বলতেই পারেন যে "হ্যাঁ; গুরুদেব আবার ফিরে আসবেন"। তবুও শেষপর্য্যন্ত আমাদের এটা বুঝতে হবে যে এমন হতে পারে যে শিষ্যই হয়ত অন্য কোন সম্প্রদায়ে চলে যাবেন এবং সেখান থেকে আবার অন্য কোন সম্প্রদায়ে; এইভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তিনি নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছবেন। শিষ্যের অন্তরের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন যে ভাবে বিকশিত হবে, সেইভাবে বাইরে থেকেও তাঁর দিক্‌বদল হবে। তিনি তাঁর নিজের গুরুদেবকেও নিত্য নবভাবে দেখবেন। প্রথমে তিনি তাঁর গুরুদেবকে একভাবে দেখেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে কোন বিশেষ ধারণা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের ভজনজীবনে যত উন্নতি হবে, ততই তিনি তাঁর গুরুদেবকে নিত্যনবরূপে দেখবেন। তখন শিষ্য ভাববেন, "আমি আমার গুরুদেবকে পূর্ব্বে ভাল বুঝতে পারিনি, তখন আমি তাঁকে এক বিশেষ রূপে দেখেছিলাম, কিন্তু পরে দেখলাম তিনি তার চেয়ে কত বেশী, তারপরে দেখলাম তিনি তার চেয়েও বেশী।" এই ভাবে ক্রমশঃ দিব্যজ্ঞানের উন্মোচন হতে পারে।

জাগতিক উপলব্ধি যেমন ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়, তেমনি চিন্ময় জগতের উপলব্ধিও ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়। গুরুদেব হলেন শক্ত্যাবেশ অবতার। কখনও কখনও অপ্রত্যাশিতভাবে, কোন অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার জন্যে কোন বিশেষ শক্ত্যাবেশ অবতারকে পাঠানো হয়, কোন বিশেষ স্থান, কাল, অবস্থার জন্যে। আবার এমন শক্ত্যাবেশ অবতারও আছেন, যিনি নিত্য কালের জন্য ; কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই অবস্থা বিশেষের প্রয়োজন অনুযায়ী ও শ্রীভগবানের দিব্যবিধান অনুযায়ী শিষ্যের সব সময়েই গুরুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে এবং তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে কোন অবিশ্বাস থাকবে না। তাঁর হৃদয়ে সে গুরুদেবের অবস্থান অনুভব করবে। তাঁর ভিতরে ভজন জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্যে যে তৃষ্ণা আছে, তা লাঘব হবে এবং তাঁর হৃদয়ে দিব্য অনুভূতির উন্মোচন হবে। কিন্তু তারপরেই তাঁর হৃদয়ে আবার নতুন করে তৃষ্ণা জেগে উঠবে তখন কে তাঁর সেই নিত্য নব তৃষ্ণার প্রশমন করবেন? — তাঁর গুরুদেব। তাঁর তৃষ্ণা সবসময়েই তাঁর গুরুদেব মেটাবেন এবং তাঁর অন্তরে কোন প্রবঞ্চনার আভাস থাকবে না। যতই তাঁর ভিতরের তৃষ্ণা মিটবে, ততই তাঁর উপলব্ধি হবে যে "আমার গুরুদেব এখানে আছেন।"

যেখানেই আমরা দেখব দিব্য অনুভূতির উন্মোচন হচ্ছে, দিব্য উপলব্ধির ক্রমবিকাশ হচ্ছে এবং তার প্রতি পূর্ণ অভিনিবেশ দেওয়া হচ্ছে, সেখানেই আমাদের বুঝতে হবে যে এর উপরদিকে আছেন স্বয়ং গুরুদেব"। "গুরুদেব আমার পথ নির্দ্দেশক। যতই আমি পরিণত হব, যতই আমার নানাধরণের শিক্ষা ও উপদেশের প্রয়োজন হবে, ততই নিত্য নব উপদেশ ও শিক্ষাও আমার জন্যে আসবে। আমার পরিণতি আমাকে নতুন জায়গায় নিয়ে যাবে। সেখানে আবার নতুন উপদেশ, নতুন জীবন আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। এইভাবে প্রগতিশীল জীবন চলতে থাকবে আর সেখানে সেই মূল সূত্রটি থাকবে — "রসো বৈ সঃ"। সেই বিশুদ্ধ অমৃতময় রস, সেই আনন্দ রূপময় অমৃত। আর আমার অন্তরের অভ্যন্তর থেকে এর জন্য ব্যাকুল তৃপ্তিমূলা সমর্থন আসবে — "এই আমি চাই, এই আমার ভাগ্য, এই আমার সৌভাগ্য।"

এইভাবে গুরুদেব স্বয়ং ফিরে আসুন বা না আসুন গুরুশিষ্যের আত্মিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে এবং শিষ্যের ভজনজীবনের ক্রমবিকাশ হওয়ায় তার বাঞ্ছিত পরিণতি সে লাভ করবে। তা না হলে কোন মধ্যম অধিকারী যদি গুরু হয়ে আসেন এবং তাঁর যদি অনেক শিষ্য থাকেন তাহলে তাঁকে বারে বারেই এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে এবং তিনি কোন সময়েই তাঁর নিত্যলীলায় প্রবেশ করতে পারবেন না। কিন্তু তা হতে পারে না। সে যাই হোক, সর্ব্বক্ষেত্রেই, যেখানে সদ্‌গুরুর সঙ্গে যাঁর যোগাযোগ আছে সেখানে তিনি নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত ফল পাবেন, কারণ শ্রীভগবান স্বয়ং সেখানে রয়েছেন।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ।।

শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ১১.১৭.২৭

অথার্ৎ ভগবান উদ্ধবকে বললেন, "হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানবে। গুরুতে সামান্য বুদ্ধি করে — মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে তাঁর অবজ্ঞা করবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।"

এখানে কৃষ্ণ বলছেন, "গুরুকে কোন সীমার মধ্যে, কোন গণ্ডীর মধ্যে ফেলো না। তুমি হয়ত তোমার ভজন জীবনের উন্নতির ফলে এমন কোন উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হয়েছ। তাই বলে কি তুমি মনে করছ যে, যে আচার্য্য তোমার আধ্যাত্মিক জীবনে তোমাকে প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে তুমি ছাড়িয়ে গেছ? না, "নাবমন্যেত" তুমি মনে কোরো না তিনি তোমার চেয়ে কিছু কম। তিনি নিম্ন অধিকারী এ কথা ভেবো

না। "নাবমন্যেত" — কারণ আমি স্বয়ং সেখানে আছি। আমিই তোমার প্রাথমিক শিক্ষার গুরু, আমিই তোমার উচ্চশিক্ষার গুরু, আমিই তোমার উচ্চতর শিক্ষার গুরু। তাই "নাবমন্যেত"— শুধু বাইরের দিকটাই দেখো না। আমিই তোমাকে উপদেশ দিতে নানারূপে এসেছি। আমিই গুরুদেব।"

"সর্ব্বদেবময়ো গুরু:" — যিনি আচার্য্য তাঁর সাধারণ বৈষ্ণবের চেয়ে অনেক বেশী বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী আছে। কৃষ্ণ বলছেন "তোমার জন্যে আমিই আছি এবং "ময়ানুকূলেন নভস্বঃতেরিতং" — সমস্ত আচার্য্যদের আমিই শক্তি দিচ্ছি, আমিই তাঁদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করছি। কত আচার্য্য এসেছেন, তাঁদের মধ্যে দিয়ে আমিই আমার কাজ করেছি, আমার উদ্দেশ্য সাধন করেছি। আচার্য্যরা যেন বিভিন্ন নৌকার কর্ণধার এবং আমি হলাম সেখানে অনুকূল বাতাস — যা আছে বলেই এইসব নৌকা তরতর করে এগিয়ে যায়। সুতরাং আচার্য্যকে সামান্য দৃষ্টিতে দেখো না, তাঁকে আমার সঙ্গে একই আসনে দেখার চেষ্টা করো।"

জনৈক ভক্ত : শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতমের ৪.১২.৩৩ শ্লোকের টীকায় ধ্রুব মহারাজের কাহিনী প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- - ধ্রুব মহারাজ খুব উচ্চস্তরের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর ক্ষমতা ছিল তাঁর মাকেও উদ্ধার করে শ্রীভগবানের পরমধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তারপরেই তিনি লিখেছিলেন, "যদি আমার কোন শিষ্যও ধ্রুব মহারাজের মত উচ্চস্তরের ভক্ত হতে পারেন, তবে তিনি আমাকেও উদ্ধার করে শ্রীভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।" তাঁর এই উক্তিটি আমাদের কাছে বেশ রহস্যময় মনে হয়।

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ : ধ্রুব মহারাজের মা-ই ছিলেন তাঁর প্রথম গুরু, তাঁর বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু, যেমন বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের গুরু ছিলেন চিন্তামণি। চিন্তামণির মাধ্যমেই কৃষ্ণের যে আচার্য্য ক্রিয়া তা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু হয়ে এলেন। সেই একইভাবে ধ্রুবকে প্রথম অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁর মা। ধ্রুব তাঁর জীবনের প্রথম আধ্যাত্মিক উপদেশ তাঁর মার কাছেই পেয়েছিলেন। তারপর তিনি নারদমুনির কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছিলেন এবং তাঁর ভজন বলে তিনি তাঁর পরের স্তরে উপনীত হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি আরও উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন। তবুও মা-ই ছিলেন তাঁর বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সেই মাকেই তিনি পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনিই হলেন বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু যিনি কনিষ্ঠ অধিকারীকে তাঁর ক্রমবিকশিত

ভজনজীবনের সূচনা করে দিয়েছেন। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ এবং তাঁর মার পূর্ব্ব জন্মটা কিরকম ছিল তাও আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে। পূর্ব্ব জন্মে ধ্রুব মহারাজ তাঁর ভজন জীবনে অনেক উন্নতি করেছিলেন। কিন্তু সেই জন্মে শ্রীভগবানের ইচ্ছা অনুসারে এইরকম ঠিক হয়েছিল যে পরের জন্মে তাঁর মা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা করে দেবেন। তারপর সেখান থেকে তিনি তাঁর ভজন জীবনের ক্রমোন্নতি লাভ করলেন। তাঁদের দুজনেরই পূর্ব্বজন্মের ভজনবল ছিল। অনেক সময় এমন হয় যে যিনি প্রাথমিক শিক্ষক তিনি হয়ত একজন অসাধারণ ছাত্র পান।

সুতরাং এরকম হতে পারে যে পূর্ব্বকল্পিত ব্যবস্থার জন্যে যাঁর যোগ্যতা কম তিনি যাঁর যোগ্যতা বেশী তাঁকে প্রথমে কোন অনুপ্রেরণ বা বিশেষ সাহায্য দিতে পারেন।এইভাবে গুরু বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভগবৎ চিন্তা দেবেন। নানা দিক থেকেই সাধক সাহায্য পেতে পারেন।

জনৈক ভক্ত: তাহলে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর যে বলেছেন, ''চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই''?

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ : যখনই বিভিন্ন দিকে থেকে যেসব বিভিন্ন আধ্যাত্মিক উপদেশ আমরা পাই, তাদের মধ্যে কোন ভিন্নতা বা পার্থক্য আমাদের চোখে পড়বে, তখনই তাদের মধ্যে যে একতা আছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। সর্ব্বোত্তম বা সর্ব্বোচ যে তত্ত্ব, তাকে আপেক্ষিক তত্ত্বের চেয়ে বেশী অভিনিবেশ বা মূল্য দিতে হবে। যে ধারণা সর্ব্বোত্তম আর যে ধারণা আপেক্ষিক দুইই আমাদের জীবনে অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে, কারণ তা না হলে প্রগতি হতে পারে না। তাই সর্ব্বোত্তম ধারণা আর আপেক্ষিক ধারণা দুইই পাশাপাশি চলবে। কিন্তু যা সর্ব্বোত্তম, তাকেই মুখ্য স্থান দিতে হবে আর যা আপেক্ষিক ও অনিত্য, তার মূল্যায়ন করা হবে স্থান, কাল পাত্র ও উদ্দেশ্য বিশেষে। তাই আমাদের জীবনের এই দীর্ঘতম যাত্রায় এবং আমাদের সর্ব্বোচ্চ পরিণতির জন্য পরম সত্যকে আমাদের দান করা হয়েছে। সর্ব্বোত্তম তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ দেওয়া হয়েছে — এবং তার মধ্যে সর্ব্বদাই একতা ও সামঞ্জস্য রয়েছে।

যে ক্ষেত্রে গুরু নিম্ন-অধিকারী, সেখানেও শাস্ত্র এই যোগাযোগ বজায় রেখেছেন— ''পরোক্ষ-বাদা বেদোঽয়ম্''? যদি সকলের কাছ থেকেই ইন্দ্রিয়-সংযম বা আত্ম সংযমের কোন উচ্চ মান আশা করা যায় যে — যেমন, তাঁরা মাছমাংস খাবেন না বা ইন্দ্রিয়তর্পণ করবেন না ইত্যাদি - তাহলে যাঁরা এখনও নিম্নপ্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হচ্ছেন তাঁরা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কখনই আসবেন না।

কিন্তু সেই চিন্ময় জগতের বিধান হল এই যে সকলকেই কোন না কোনদিন আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে পা বাড়াতে হবে। তাই যাঁদের নিম্নপ্রবৃত্তি, তাঁদের জন্যে বিধিবিধান কিছু শিথিল করা হয়েছে। শিষ্যের যেমন যোগ্যতা সেই অনুযায়ী তিনি তাঁর উপযুক্ত গুরু ও উপযুক্ত শাস্ত্র পাবেন, তবে আশার কথা হল এই যে তাঁরা ক্রমশঃ উন্নত হবেন। শাস্ত্র এতই উদার যে সমাজের সবচেয়ে নিম্নমানের ক্ষেত্রেও তা প্রবেশ করতে পারে, তাঁদের জন্যও উপযুক্ত শাস্ত্র ও উপযুক্ত গুরু আছে। উপযুক্ত গুরু, উপযুক্ত শাস্ত্র ও উপযুক্ত সাধু—সবচেয়ে নিম্নমানের ক্ষেত্রেও তাঁদের পাঠানো হয়েছে মায়াবদ্ধ জীবকে ক্রমোন্নতির পথে তুলে আনার জন্যে।

শাস্ত্রের মধ্যে এই চিন্তা রয়েছে যে এই ক্রমোন্নতির পথে বিধিবিধানের কিছু শিথিলতা থাকবে, কারণ তা না হলে অনেকেই এই পথ ছেড়ে চলে যাবেন। এক অনন্ত চেতনার মধ্যে এই ধারণা বা বিবেচনাটি আছে এবং যেসব ঋষিরা এইসব শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন তাঁদের মধ্যেও এই উপলব্ধি আছে। যেসব গুরুরা এই স্তরের শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন তাঁরাও সে সম্বন্ধে সচেতন। সাধু এবং শাস্ত্র সর্ব্বনিম্ন চরম পাপময় ক্ষেত্রেও যান, কারণ তা না হলে ঐ সর্ব্বনিম্ন ক্ষেত্র থেকে উদ্ধারের আশা কারোর কোনদিন থাকবে না। কিন্ত ক্রমশঃ শিষ্য বা সাধক তাঁর নিজের স্তরে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করবেন। তাঁর উপলব্ধির স্তর এখন যেখানে আছে, তাঁর আত্মিক বিকাশ যেখানে এসে পৌঁছেছে তিনি সেখান থেকেই শুরু করবেন এবং ক্রমশঃ উপরে উঠবেন। তাঁর যাত্রাপথে তিনি যতই এগোবেন ততই তাঁর উপযুক্ত গুরু ও শাস্ত্র খুঁজে পাবেন।

আমরা যে এখন একটা আপেক্ষিক অবস্থায় আছি একটি উপমা দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের দৃষ্টি আলোর একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা বা চৌহদ্দির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। খুব তীব্র, চড়া আলো বা খুব ক্ষীণ আলো আমাদের চোখ দেখতে পায় না। শব্দের বেলাতেও তাই। খুব তীব্র চড়া আওয়াজ বা খুব ক্ষীণ আওয়াজ কোনটাই আমরা শুনতে পাই না। সুতরাং আমরা একটা আপেক্ষিক অবস্থায় আছি। কিন্তু যা পরিপূর্ণ, তাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য সেই পরম তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের সর্ব্বদাই যোগাযোগ রাখতে হবে। তাই আচার্য্যর অবস্থানটা কোথায় সেটা আমাদের বুঝতে হবে, তাঁকে ছোট করলে চলবে না। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তিনিও জাগতিক অভ্যাসের অধীন, তিনিও খাচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন, তবুও তাঁকে অশ্রদ্ধা করা চলবে না। তাহলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবো। যেমন গঙ্গাজল; তার মধ্যে কাঠ, পাথর, ফেনা, এসব আমরা দেখবো না। গঙ্গাজল সবকিছুই পবিত্র করতে পারে।

কি আছে তার মধ্যে যা পবিত্র করতে পারে? সে কি শুধু জল, না তার মধ্যে আরও কিছু আছে? সেই বিশেষ বস্তুটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি, তাহলে তার মধ্যে শ্রীভগবানের আদেশটা আমরা সেখানে দেখতে পাব। তাঁর আদেশেই গঙ্গা সবকিছু পবিত্র করেন। সুতরাং গঙ্গার পবিত্র করার শক্তি ভগবানের আদেশ থেকে আসছে, এর পিছনে তাঁর ইচ্ছা ও সমর্থন রয়েছে। সর্ব্বক্ষেত্রেই ভগবানের ইচ্ছা ও সমর্থনকে আমাদের খুঁজে নিতে হবে। আর তা করতে গিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র, আপেক্ষিক অবস্থাকে যদি আমরা ত্যাগ করতে না পারি তাহলে আমাদের নির্ব্বিশেষের স্তরে পৌঁছে যেতে হবে, যেখানে সেবার কোন স্থান নেই।

কৃষ্ণ আর তাঁর পরিকরবৃন্দের মধ্যে যে বৃত্ত, তাই হল পরিপূর্ণ। শক্তিমান্ আর তাঁর শক্তি – এই দুইয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যে আমাদের ব্যাকুলতা থাকবে। এই দুইয়ের কাউকে ছেড়েই আমরা থাকতে পারব না —– বিশেষ করে শক্তিকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলেছেন, " রাধারাণী ছাড়া কৃষ্ণকে আমি চাই না। বরং আমি রাধারাণীকেই চাই।" তাহলে প্রশ্ন হল রাধারাণী কে? কি তার স্বরূপ? তিনি হলেন সেই একজন যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণময়ী। তাই দাস গোস্বামী বলেছেন – "আমি রাধারাণীকেই চাই"। সেখানেই কৃষ্ণ তাঁর সর্ব্বোত্তম রূপে আছেন। আবার অন্যান্য নানা আপেক্ষিক সম্পর্কের মধ্যেও তিনি আছেন। প্রত্যেকের কাছেই তিনি আসেন, কিন্তু কারোর কাছে তিনি মধুররূপে আসেন, কারোর কাছে মধুরতর রূপে। কারো কাছে মধুরতম রূপে। এইভাবে আমরা আপেক্ষিকতাকে বুঝতে পারি।

জনৈক ভক্ত : আমরা শুনেছি ভক্তির পাঁচটি অঙ্গ আছে : সাধুসঙ্গ, শ্রীনাম জপ বা কীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তি সেবন ও ধামবাস। সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তরাই কি ধামবাস করতে পারেন, না শুধু উচ্চশ্রেণীর ভক্তরাই ধামবাস করতে পারেন?

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ : সাধারণতঃ মধ্যম অধিকারীর জন্যেই একথা বলা হয়েছে, কারণ তাঁদের তারতম্য বিচার করার ক্ষমতা আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন অধিকার সম্বন্ধে কনিষ্ঠ অধিকারীর তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই; কে উত্তম অধিকারী, কে নিরপেক্ষ, কে ঈর্ষাপরায়ণ – এসব ব্যাপারে তারতম্য বিচারে ক্ষমতা কনিষ্ঠ অধিকারীর নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের অর্থই হলো প্রকৃত সমন্বয় সাধন করা, সামঞ্জস্য খুঁজে নেওয়া – আমাদের গুরু মহারাজ প্রায়ই একথা বলতেন। সমন্বয় সাধন করার জন্য প্রয়োজন হল সম্বন্ধ জ্ঞানের। প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ কি তা আমাদের জানতে হবে। প্রত্যেকেরই সেবা সেই সম্বন্ধজ্ঞান অনুসারেই স্বতঃ স্ফূর্ত্তভাবে আসবে,

প্রত্যেকের প্রয়োজন ও গন্তব্যস্থানও তার থেকেই আসবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী হলেন সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য্য। "কে আমি," "কোথায় আমি", এইসব প্রশ্নের উত্তর যখন পাওয়া যায়; যখন জানা যায় "কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয় ?", যখন জানা যায় "আমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ?" – তখনই নিত্য আর অনিত্যের মধ্যে, পরমসত্য আর আপেক্ষিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। তাই এর কোনকিছুকেই ত্যাগ করা যায় না।

আর একটা কথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, কর্ত্তৃত্বের ভাব নিয়ে গবেষণা করে সেই উচ্চস্তরের জ্ঞান বা তার সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমরা কিছুতেই বুঝতে পারব না। বরং যে পরিমাণে আমরা শরণাগত হব, আত্মনিবেদন করব সেই পরিমাণেই সেই সত্য অবতরণ করে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশিত করবেন। একথাটা আমাদের সবসময়ই মনে রাখতে হবে, তা না হলে অনুকরণের প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে এসে যাবে। চিন্ময় জগতের জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির আওতায় পড়ে না এবং সেরকম কথা চিন্তা করাও খুব বিপদজনক। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা খুব বিপদজনক, কারণ এর থেকে আমাদের মনে হতে পারে যে যিনি অসীম তাঁকে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছি। এতে শ্রীভগবানের গুণের মধ্যে যে অসীমত্ব আছে তাকে, তাঁর অনন্ত সত্ত্বাকে অবহেলা করা হয়। শ্রীভগবান হলেন অধোক্ষজ, তিনি আমাদের জাগতিক গবেষণার বাইরে।

আমি একবার শ্রীল প্রভুপাদকে (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে) এই প্রশ্ন করেছিলাম যে, "শ্রীল রূপ গোস্বামী, তিনি শ্রীবলরামের রাসলীলার এক রকম ব্যাখা দিয়েছেন, আবার শ্রীল সনাতন গোস্বামী তার আর একরকম ব্যাখা দিয়েছেন; অথচ তাঁরা দুজনেই তো মহাপ্রভুর কাছ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ পেয়েছিলেন, তবে তাঁদের ব্যাখার মধ্যে ভিন্নতা হল কেন?" তখন আমার গুরু মহারাজ বললেন "তাহলে আর কৃষ্ণকে 'অধোক্ষজ' কেন বলা হয়েছে? যিনি অধোক্ষজ তাঁকে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বোঝা বা মাপা সম্ভব নয়। এ হল অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব। দুটি ব্যাখাই একই সঙ্গে সত্য"। এ হল অচিন্ত্য, আমাদের চিন্তাশক্তির বাইরে। আচার্য্যরা এর ব্যাখা করে বলেছেন যে "শ্রীবলদেব যখন রাসলীলা করছেন তখন তিনি তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত কৃষ্ণের উপভোগের জন্যই তা করছেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন বলদেব গোপীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে রাসলীলা করছেন। কিন্তু ভিতরে তিনি কৃষ্ণকেই সেই রাসলীলা উপভোগ করাচ্ছেন। তিনি নিজে সেই রাসলীলার ভোক্তা নন।" এইভাবে উপর থেকে যে শিক্ষা আসে তার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায়;

তা সমন্বয় সাধন করতে সমর্থ আর আমরাও এইভাবে সবকিছুর সমন্বয় সাধন করব।

জনৈক ভক্ত : —মহারাজ, শ্রীধামে যে সব ভিন্ন ভিন্ন গাছপালা পশু -পক্ষী, কীটপতঙ্গ আছে, তাদের আমরা কি চোখে দেখব?

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ ; তারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, কোন কর্ম্মবন্ধনে তারা আবদ্ধ নয়। তারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন সেবা আছে আর তারা প্রত্যেকেই নিজের সেবার ভূমিকায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। সেই সেবার ভিতর দিয়ে অন্তরে তারা পরম আনন্দ অনুভব করে, সেজন্যে আর কিছু তারা চায় না। তাদের যে নিজ নিজ আপেক্ষিক ভূমিকা তাতে তারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। যারা অন্য রসে আছে, সখ্য বা বাৎসল্য, তারাও প্রত্যেকেই ভাবছে " আমি যা পেয়েছি তাই সর্ব্বোত্তম। সেবার সবচেয়ে ভাল অধিকারই আমি পেয়েছি, এছাড়া আর কিছু আমি চাই না"। "যার যেই রস, সেই হয় সর্ব্বোত্তম।" শান্ত রসেও তাই। সেখানে গাছপালা, পশুপক্ষী, সবই আছে, যদিও তাঁদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। উদ্ধব, যিনি দ্বারকায় সর্ব্বোত্তম ভক্ত, তিনি বৃন্দাবনে লতা বা ঔষধি হয়ে জন্ম নেবার জন্য প্রার্থনা করছেন। তাই শান্ত রসের মধ্যেও গুণগত পার্থক্য আছে। দ্বারকাতেও শান্ত রস আছে। কিন্তু যিনি দ্বারকায় সখ্য রসে শ্রেষ্ঠভক্ত, তিনি যখন বৃন্দাবনের যে পরম সেবা তার নানারূপের একটু আভাসমাত্র পেলেন, তখন তিনি সেই বৃন্দাবনে শান্ত রসের সেবা অধিকারের জন্যে প্রার্থনা করলেন। এর থেকে এই বোঝা যায় যে পরমধামের পরমতত্ত্বের কাছে অন্য জায়গায় যা শ্রেষ্ঠ তাও আপেক্ষিক হয়ে যায়, সেখানে তার শ্রেষ্ঠতা আর থাকে না। তাই আপেক্ষিক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক ভূমিকায় যে তুষ্টি আছে, পরমতত্ত্বের স্থান সবসময়েই তার উপরে। তা না হলে যা সর্ব্বোত্তম যা পরিপূর্ণ তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

তাই যে কোন সেবার ভূমিকা থেকেই পরমতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতার উপলব্ধি সম্ভব। যদিও সব ভক্তরা নিজের নিজের সেবার ভূমিকায় সন্তুষ্ট আছেন, তবুও বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠতা তাঁরা উপলব্ধি করেন। তটস্থ বিচার সেখানে সব সময়ই আছে, আর যা আপেক্ষিক আর যা পরম, তার মধ্যে পরমতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বদাই স্বীকৃত হয়। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" যখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎ গীতায় বলেছেন (১৮।৩৬) —"সর্ব্বরকমের ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, সর্ব্বরকমের সামাজিক ও নৈতিক কর্ত্তব্য ত্যাগ কর, এমনকি আমি নিজেও নানা শাস্ত্রে যে বিধান দিয়েছি এবং আমি নিজেও এখানে পূর্ব্বে তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছি সে সবই ত্যাগ কর এবং কেবল সর্ব্বান্তঃকরণে আমাতে আত্মনিবেদন কর, আমার শরণাগত হও"— তখন এটা

স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যা পরমতত্ত্ব তা হল "বিপ্লবী" — তা হল সর্ব্বশ্রেষ্ঠআর যা আপেক্ষিক, যা বিধিবিধানসম্মত — তার অনেক উপরে তার স্থান।

সর্ব্বক্ষেত্রেই এই পরমতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। যেমন গুরুপ্রসঙ্গে বলা যায় শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের গুরুদেব হলেন শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী। তবুও নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা জানাচ্ছেন "কবে আমার গুরু লোকনাথ আমার হাত ধরে শ্রীল রূপ গোস্বামীর পাদপদ্মে নিয়ে যাবেন; কবে আমি শ্রীরূপের কাছে আত্মনিবেদন করে তাঁর আনুগত্যে থেকে আমার সেবা -অধিকার পাব?"

"শ্রীরূপের কৃপা যেন মোর প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয়।
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে।
হেন কি হইবে মোর – নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে।।"

প্রার্থনা

এই ধরণের উচ্চস্তরের অভিব্যক্তির, এই ধরণের ব্যাকুল প্রার্থনার অন্তরালে, সেই পরমতত্ত্বের উপলব্ধিই অন্তর্নিহিত রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

অতীন্দ্রিয় দর্শন

জনৈক ভক্ত ঃ গুরু মহারাজ ! তুলসী দেবীর সম্বন্ধে আমার একটি প্রশ্ন আছে। এই মঠের ভক্তরা বলেন যে তাঁদের জপের মালা যদি সত্যিই তুলসী দিয়ে তৈরী নাও হয়, তবুও আপনি যখন সেই মালায় জপ করে দেন তখন আপনার হাতে সেই জপের মালা সত্যিই তুলসীর মালা হয়ে যায়। তাহলে জপের মালা সত্যি সত্যি তুলসী দিয়ে তৈরী কিনা সেটা কি ততটা গুরুত্বপূর্ণ?

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ ঃ এর চেয়ে উচ্চস্তরের একটি ভাবনা বা বিচার আছে যেটি বৈকুণ্ঠ বিচার। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে –

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুনপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।

অর্থাৎ যিনি এই স্থুল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্মবুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং সাধারণ জলে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবৎভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি, তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গরুদের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।'' যেমন 'ভৌম' বা জড় বস্তু আছে তেমনি 'ইজ্য' বা যা 'পূজ্য' তাও আছে। যা আমার শ্রদ্ধার বস্তু, পুজার বস্তু, তাকে আমি জড় বস্তু দিয়ে তৈরী বলে মনে করি তবে তাতে আমার অপরাধ হবে। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে-

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী গুরুষু নরমতি বৈঁষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্ণাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কলুষবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে সে নারকী"।

সুতরাং যা চিন্ময় বস্তু তাকে জড়বস্তু মনে করার মনোবৃত্তিকে আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। চিন্ময় বস্তুই সত্যিকারের প্রয়োজনীয়, জড়বস্তু নয়। প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ কি তা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে।

প্রবঞ্চিত রাবণ

একদা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে রামানুজ সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। সেই ভক্ত ব্রাহ্মণ রাবণের সীতাহরণের কাহিনী শুনে খুব শোকার্ত্ত ছিলেন। তিনি কোনক্রমে প্রতিদিন তাঁর ইষ্ট দেবতাকে ভোগ দিতেন, কিন্তু নিজে প্রায় উপবাসেই থাকতেন। সর্ব্বদাই তিনি ক্রন্দন ও অনুশোচনা করতেন।

মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি প্রসাদ গ্রহণ করছ না কেন?" তিনি বললেন, "আমার মৃত্যু হলেই ভাল। আমার আদরের মা জানকীকে অসুরে হরণ করে নিয়ে গেল এও আমাকে শুনতে হল। এ কথা শোনার পর আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।"

তখন মহাপ্রভু তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, "না, না ওকথা ভেবো না। সীতাদেবী তো স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী। তিনি তো চিন্ময়ী, মূর্ত্তিমতী চেতনা। তাঁর শরীর তো জড়বস্তু দিয়ে তৈরী নয়, তিনি তো রক্তমাংসের মানুষ নন, তাঁকে হরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কি করে রাবণ তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে পারে? রাবণের ক্ষমতাই ছিল না তাঁকে স্পর্শ করার, এমনকি তাঁকে দর্শনও করা! সীতাদেবীর শরীর এমন বস্তুতে তৈরী যা রাবণ দেখতে বা স্পর্শ করতে পারে না। এই হল প্রকৃত ঘটনা। সুতরাং শুধু শুধু তুমি কষ্ট পেও না। আমি বলছি তুমি প্রসাদ গ্রহণ করো।" তখন সেই ভক্ত মনের শান্তিতে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

তারপর শ্রীমন্ মহাপ্রভু নদী, প্রান্তর, নগর, জনপদ পেরিয়ে আরও দক্ষিণে চলে গেলেন। এক জায়গায় এসে তিনি দেখলেন, কয়েকজন ভক্ত মিলিত হয়ে

একসঙ্গে কুর্মপুরাণ পড়ছেন। তাঁরা ঐ গ্রন্থের সেই জায়গাটা পড়ছিলেন যেখানে বলা হয়েছে যে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করতে এসেছিল তখন সীতাদেবী অগ্নিতে প্রবেশ করে অগ্নিদেবের আশ্রয় নিয়েছিলেন। অগ্নিদেব তখন এক নকল সীতা তৈরী করে রাবণকে দিলেন আর রাবণ সেই মায়া সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। তারপর রাবণ বধ করে এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে, সীতাকে লঙ্কা থেকে নিয়ে যাওয়ার আগে রামচন্দ্র বললেন, "একবছর ধরে সীতা দেবী রাবণের প্রাসাদে বাস করেছেন। সুতরাং তাঁর সতীত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। অতএব তাঁর অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া তাঁকে আমি গ্রহণ করতে পারি না।" তখন তা শুনে সীতাদেবী স্থির করলেন তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করবেন। তাই শুনে সব ভক্তরা শোকার্ত্ত হয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। তবুও রামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর ইচ্ছায় চিতা প্রস্তত হল এবং সীতাদেবী অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু আগুন যখন নির্ব্বাপিত হল তখন সীতাদেবী অক্ষত দেহে স্মিতহাস্যে অগ্নিকুন্ড হতে আর্বিভূতা হলেন। তখন সব ভক্তরা পরম আনন্দে জয়ধ্বনি দিলেন, "সীতাদেবী কি জয়"।

এই ঘটনা কুর্মপুরাণে বর্ণিত ছিল। তখন মহাপ্রভু পাঠকগণকে বললেন, "আপনারা দয়া করে আমাকে এই মূল পৃষ্ঠাটি দিন আর তার জায়গায় একটা নতুন প্রতিলিপি এই পুথিতে ঢুকিয়ে দিন। আমি এক ব্রাহ্মণকে জানি যিনি সীতাদেবীকে রাবণ হরণ করেছিল এই কথা ভেবে খুব মনোকষ্টে ছিলেন। আমি এই প্রাচীন গ্রন্থের পৃষ্ঠাটি দেখিয়ে তাঁকে বোঝাতে চাই যে আমি তাঁকে শুধু সান্ত্বনাই দিচ্ছিলাম না। একথা সত্যসত্যই শাস্ত্রে আছে যে রাবণ কখনও প্রকৃত সীতাদেবীকে স্পর্শ করতে পারেনি, কারণ তিনি চিন্ময়ী, তিনি মূর্ত্তিমতী চেতনা, তাঁর শরীর রক্তমাংস দিয়ে তৈরী নয়।"

চেতনার চিন্ময় রূপ

একটা ভূত যদি তার নিজের রূপ আমাদের দেখাতে পারে, একজন যোগী যদি তাঁর রূপটা দেখাতে পারেন তবে শ্রীভগবান কি তাঁর নিজের রূপ দেখাতে অক্ষম? তিনি নিশ্চয়ই সক্ষম। তিনি যখন ইচ্ছা করলেন জলের সৃষ্টি হবে তখন জলের সৃষ্টি হল। যখন তিনি আলো চাইলেন তখন আলোর সৃষ্টি হল। তাঁর ইচ্ছাই আইন, তাঁর ইচ্ছাই নিয়ম। তিনি যা করতে চান তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। সুতরাং তাঁর কি একটা রক্তমাংসের শরীরের প্রয়োজন আছে? শুধু তাঁর ইচ্ছাক্রমে যে কোন মূহর্ত্তে, যে কোন বস্তু, যে কোন রূপ তিনি দেখাতে সক্ষম এবং তা সবই চিন্ময়, কোন নশ্বর বস্তুর

মালিন্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু যে জগৎ প্রকৃত সত্যের — বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই জগতের চোখ এখানকার রক্তমাংসের চোখের মত নয়। সবই সেখানে আছে, চোখ কান সবই, কিন্তু তা এখানকার মত নয়। যেমন স্বপ্নের মধ্যে আমাদের রক্তমাংসের চোখ কাজ করে না, এই কানও কাজ করে না। তবুও স্বপ্নের মধ্যে আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি, হাঁটাচলা, খাওয়াদাওয়া সবই করি। মন, সে কেবল "অর্দ্ধেক জড় বস্তু"— চিদাভাস। তবু সেই মনের জগতেও এইসব অতীন্দ্রিয় কাজকর্ম্ম সম্ভব। সেই জগতকে অতিক্রম করে যে বিশুদ্ধ চিন্ময় জগত আছে সেখানে চিন্ময় নয়ন, চিন্ময় কর্ণ, চিন্ময় হৃদয় আছে — সবই সেখানে চিন্ময়। এ খুবই যুক্তিসঙ্গত।

যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দুদিক থেকে দুটো ট্যাঙ্ক পরস্পরকে আঘাত করতে আসে, তখন লোকে ভাবতে পারে যে দৈত্যের মতো ট্যাঙ্ক দুটো পরস্পরকে আঘাত করছে। হ্যাঁ, ট্যাঙ্ক দুটো পরস্পরকে আঘাত করছে ঠিকই, কিন্তু তার ভিতরে মানুষ আছে। সেই রকম এই দেহের ভিতরে যে আত্মা তারও নিজের দেহ আছে। তাঁর নিজের জীবনযাত্রা আছে, নিজের খাদ্য আছে, চিন্ময় জগতে তার নিজের সবকিছুই আছে। আর এই জগত হল সেই চিন্ময় জগতেরই বিকৃত প্রতিবিম্ব। সেই চিন্ময় জগতের চিন্ময় জীবনের জন্য আমাদের নিশ্চয়ই একটা আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকা প্রয়োজন। সেই আন্তরিকতা নির্ভর করে নির্ম্মলা ভক্তির উপর, আর প্রেমভক্তির প্রথম সোপান আত্মত্যাগ। সত্যিকারের বাঁচার জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হবে। এই বিষয়ীর জগতে যে স্বার্থময় জীবন আমাদের আছে তার সম্পূর্ণ মৃত্যু হওয়া দরকার, তখনই অন্য এক চিন্ময় চেতনা আমাদের ভিতরে জেগে উঠবে এবং আমরা তখন সেই জগতে বাস করব। এই হল আমাদের আন্তরিক বাসনা আর তার জন্য কত কাছের জিনিসকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি — আমাদের বাড়ীঘর, সম্পত্তি, বন্ধুবান্ধব, বাবা মা, ছেলেমেয়ে, আত্মীয় স্বজন, সব কিছু। কত কিছুই আমরা পিছনে ফেলে এসেছি, তার কারণ আমরা অন্য কিছুর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছি। মর্ত্ত্য বিষয় সম্পদে আমাদের আর মোহ নেই, কারণ আমরা নিশ্চিত হয়ে কোন অমর্ত্ত্য বস্তুকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মর্ত্ত্য মানে যা মৃত্যুর অধীন, প্রত্যেক মূহুর্ত্তেই তার মৃত্যু হচ্ছে। এই দেহের ভরণপোষণের জন্য যা কিছুর উপর আমরা নির্ভর করি তা প্রতিমূহুর্ত্তেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সবকিছুই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা এই মৃত্যুময় ভূমি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে এমন কোন ভূমিতে বাস করতে চাই যেখানে মৃত্যু নেই। সেই হল অমৃত -- যেখানে মৃত্যু নেই, সেই হল মধুর,

সেই হল বৈকুণ্ঠ, সেই হল গোলোক। বৈকুণ্ঠের অর্থ হল যেখানে অনন্তের বাসভূমি। যেখানে সব কিছু কুণ্ঠাহীন, কুণ্ঠাহীন অসীমের — আনন্দ লীলাময় অনন্তের জগৎ। বৈকুণ্ঠে বাস করার অর্থ। যিনি পূর্ণ, যিনি অনন্ত — তাঁর আশ্রয়ে বাস করা।

বিশুদ্ধ প্রার্থনা

জনৈক ভক্ত ঃ মহারাজ, শ্রীমতী তুলসীদেবীর সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন আছে। আমি লক্ষ্য করেছি এই মঠের ভক্তরা যখন তুলসীদেবীর আরতির পর তাঁকে পরিক্রমা করেন, তখন তাঁরা পাপক্ষয়ের মন্ত্রটি ("যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ") বলেন না। এর কারণ কি?

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ ঃ উচ্চস্তরের ভক্ত যিনি হবেন, তিনি "আমাকে পাপ থেকে নিষ্কৃতি দিন" বলে কোন প্রার্থনা করবেন না। যিনি উত্তম ভক্ত তিনি এই প্রার্থনাই করবেন যে, "আমি যত দোষ করেছি, যত পাপ করেছি তার জন্য আমি সব কষ্ট পেতে রাজী আছি। আমার ঋণ আমি শোধ করতে তৈরী আছি, শেষ পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত। আমার শুধু একটাই প্রার্থনা যে আমি যেন কৃষ্ণের কৃপা রূপ অমৃতের এক বিন্দু পাই।" প্রকৃত ভক্ত এই প্রার্থনাই করবেন।

> **"পশু পাখী হয়ে থাকি, স্বর্গে বা নিরয়ে।**
> **তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে।।"**

শুদ্ধ ভক্ত একথাই বলেন, "আমার কর্ম্ম অনুযায়ী আমি পশু বা পক্ষী হয়ে জন্মাতে পারি, এমনকি কীট পতঙ্গও হতে পারি। আমি স্বর্গে থাকব না নরকে থাকব তা নিয়ে চিন্তা করি না। আমার কর্ম্ম অনুযায়ী আমি ফল ভোগ করব। আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, সেটি হল এই যে কৃষ্ণের কৃপা থেকে যেন আমি বঞ্চিত না হই। সেটি যেন আমি পাই। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে যেন আমার প্রেমভক্তি থাকে, তাঁর সেবা অধিকার যেন আমি পাই। আমার কর্ম্ম অনুযায়ী আমি পাপ ভোগ করব না পুণ্য ভোগ করব তা নিয়ে আমি চিন্তা করি না। আমার প্রতি কৃষ্ণের একবিন্দু কৃপাও যেন কোন মতে নষ্ট না হয়, তা যেন আমার প্রেমভক্তিকে, আমার সেবার জীবনকে পরিপুষ্ট করে। কারণ কৃষ্ণের কৃপাই সর্ব্বোচ্চ আশীর্ব্বাদ আর পাপ-পূণ্য, স্বর্গ-নরকের দায়িত্ব অনেক নীচুস্তরের মালিকের।"

পাপপুণ্য থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অনেক নীচুস্তরের জিনিস, শ্রীভগবানের

অনেক নীচে তাঁর যে প্রতিনিধিরা আছেন তাঁরাই তা করতে সক্ষম। আমরা কৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করব কেবল তাঁর সেবা-অধিকার পাওয়ার জন্যে, মায়ার অধীনে থাকাকালীন ভ্রান্তধারণা বশতঃ পূর্বকৃত কর্ম্মক্ষয়ের জন্য নয়। 'পাসপোর্ট নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না, আমরণ "ভিসা" টা চাই। সেই জগতে প্রবেশের অনুমতি যদি পাই, "ভিসা" যদি পাই, তবে এই জগৎ ছাড়ার অনুমতির জন্য, বা "পাসপোর্ট"এর জন্য আর চিন্তা করতে হবে না। শুধু মায়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া, ভ্রান্তধারণা ও মোহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই সব নয়। কৃষ্ণের পরমধামে তাঁর সেবা অধিকার পাওয়া আরও অনেক উচ্চস্তরের জিনিস। মায়াকে অতিক্রম করে আমরা বিরজা, ব্রহ্মালোকে যেতে পারি মুক্তিও পেতে পারি। কিন্তু সেই নির্ব্বিশেষের জগতে স্থান পাওয়ার জন্যে আমি আমার শক্তি কেন ক্ষয় করব? আমার সমস্ত প্রচেষ্টা থাকবে শুধু সেই প্রার্থনা করার জন্যে যে গোলোকের সেবাধামে আমি যেন আমার স্থানটি পাই। সেই হল সর্ব্বোচ্চ প্রাপ্তি। তার জন্য যদি আমি প্রার্থনা করতে পারি তাহলে অন্য সব কিছু আপনা আপনিই সম্পন্ন হয়ে যাবে। যা সর্ব্বোচ্চ তা যদি আমি পাই তাহলে অন্য সব কিছুও পাব।

যমরাজের সঙ্গে সাবিত্রীর সাক্ষাৎ

পুরাণে একটি কাহিনী আছে যার মধ্যে এই তত্ত্বটি রয়েছে। সেটি হল সাবিত্রী ও সত্যবানের কাহিনী। সত্যবানের স্ত্রী সাবিত্রী খুব সতী-সাধ্বী তেজস্বিনী নারী ছিলেন। তাঁর চরিত্র ও তপস্যাবলে তিনি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। সত্যবানও মহা ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেন শাল্বদেশের রাজা ছিলেন। তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং তাঁর পুত্র তখনও বালক, এই সুযোগ পেয়ে শত্রু তাঁর রাজ্য হরণ করে। তখন দ্যুমৎসেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বনবাসে চলে যান এবং সেখানেই তপশ্চর্য্যা করতে থাকেন। সাবিত্রী ছিলেন মদ্রদেশের অশ্বপতি নামক রাজার একমাত্র কন্যা। সাবিত্রীর জন্মের আগে সন্তানহীন রাজা অশ্বপতি সন্তান কামনায় সূর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী,— সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে লক্ষ হোম করেন। আঠার বৎসর পূর্ণ হলে দেবী সাবিত্রী তুষ্ট হয়ে হোমকুন্ড থেকে উঠে রাজাকে বর দিলেন যে বহু পুত্রের পরিবর্ত্তে তাঁর একটি তেজস্বিনী কন্যা হবে। দেবী সাবিত্রী দান করেছেন তাই রাজা তাঁর কন্যার নাম রাখলেন 'সাবিত্রী'। এই মূর্ত্তিমতী লক্ষীর ন্যায়, পদ্ম-নয়না রাজকন্যা সাবিত্রী অসাধারণ তেজস্বিনী, গুণাবতী ও বিদুষী ছিলেন ও তিনি স্বেচ্ছায়, বনবাসী সত্যবানের গুণে মুগ্ধ হয়ে, তাঁকে পতিরূপে বরণ করেন। দেবর্ষি নারদের প্রসাদে সাবিত্রী জানতেন যে তাঁর স্বামী

সত্যবান স্বল্পায়ু ছিলেন এবং সত্যবানের মৃত্যুর সঠিক দিনও তিনি জানতেন। সাবিত্রী যখন দিন গণনা করে দেখলেন যে আর চারদিন পরে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হবে তখন তিনি ত্রিরাত্র উপবাসের সঙ্কল্প করলেন। সত্যবানের মৃত্যুর দিনে সাবিত্রী পূর্বাহ্নের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করলেন এবং গুরুজনদের প্রণাম করলেন। শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁকে বললেন, "তোমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে এখন আহার কর। সাবিত্রী বললেন, "সূর্য্যাস্তের পর আহার করব এই সঙ্কল্প করেছি।" সত্যবান কাঁধে কুঠার নিয়ে বনে যাচ্ছেন দেখে সাবিত্রী বললেন, আমিও আজ তোমার সঙ্গে বনে যাব।" সত্যবান বললেন, "তুমি এর আগে কখনও আমার সঙ্গে দুর্গম বনে যাওনি, পথও কষ্টকর, তার উপর উপবাস করে দুর্ব্বল হয়ে আছ, কি করে পায়ে হেঁটে যাবে?" সাবিত্রী বললেন উপবাসে আমার কষ্ট হয়নি, তোমার সঙ্গে যাবার জন্যে আমি খুবই ইচ্ছুক, তুমি বারণ করো না।" সত্যবান বললেন" তবে আমার পিতামাতার অনুমতি নাও, তাহলে আমার দোষ হবে না।" তখন সাবিত্রী শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে যেন সহাস্য বদনে কিন্তু সন্তপ্ত হৃদয়ে স্বামীর সঙ্গে বনে গেলেন।

সত্যবান ফল পেড়ে তাঁর থলি ভর্ত্তি করলেন, তার পর কাঠ কাঠতে লাগলেন। পরিশ্রমে তাঁর ঘাম হতে লাগল, মাথায় বেদনা হল। তিনি কুঠার ফেলে দিয়ে সাবিত্রীর কাছে এসে বললেন, "সাবিত্রী, আমি অত্যন্ত শ্রান্ত ও অসুস্থ বোধ করছি, আমার মাথা যেন শূল দিয়ে বিঁধছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই।" সাবিত্রী তখন তাঁর স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন। মূহুর্ত্তকাল পরে তিনি দেখলেন, এক দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন ভয়ংকর পুরুষ কাছে এসে সত্যবানকে নিরীক্ষণ করছেন, তাঁর পরিধানে রক্তবাস, কেশ চূড়াবদ্ধ, হস্তে পাশ। তাঁকে দেখে সাবিত্রী স্বামীর মাথা তাঁর কোল থেকে নামালেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে কম্পিত হৃদয়ে বললেন, "আপনার মূর্ত্তি দেখে বুঝেছি আপনি দেবতা। আপনি কে, কি ইচ্ছা করেন?"

তখন যমরাজ, বললেন "সাবিত্রী তুমি পতিব্রতা, তপশ্চারিণী, এজন্যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে, এখন আমি এঁকে নিয়ে যাব। সত্যবান ধার্ম্মিক ও গুণসাগর, সেজন্যে অনুচর না পাঠিয়ে আমি নিজেই এসেছি।" এই বলে যম সত্যবানের দেহ থেকে তাঁর অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সূক্ষ শরীরকে পাশবদ্ধ করে টেনে নিলেন। সত্যবানের প্রাণশূন্য দেহ শ্বাসহীন, নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে রইল। যম দক্ষিণ দিকে চললেন। তখন শোকার্ত্তা মহিয়সী ও তেজস্বিনী সাবিত্রীও তাঁর পশ্চাতে চললেন। সাবিত্রীকে পশ্চাতে আসতে দেখে যম বললেন, "সাবিত্রী, তুমি

স্বামীর ঋণ শোধ করেছ, এখন ফিরে গিয়ে এঁর পারলৌকিক ক্রিয়া কর। তোমার পক্ষে যতখানি আসা সম্ভব ততখানি তুমি এসেছ, এবার ফিরে যাও।"

সাবিত্রী বললেন, "আমার স্বামী যেখানে যান অথবা তাঁকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, আমারও সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য এই সনাতন ধর্ম। আমার তপস্যা ও পতিপ্রেমের বলে এবং আপনার প্রসাদে আমার গতি প্রতিহত হবে না। পন্ডিতরা বলেন একসঙ্গে সাত পা গেলেই মিত্রতা হয়; সেই মিত্রতার উপর নির্ভর করে আপনাকে কিছু বলছি শুনুন। যে ধর্মপথ সাধুজনের সম্মত সেই পথের অনুসরণ করাই ভাল, অন্যপথে না গিয়ে। আমরণ সাধুজন-সম্মত গাহর্স্থ্য আশ্রম অবলম্বন করেই ধর্ম্মপথে এসেছি, এখন আর অন্য আশ্রমে যেতে চাই না।"

যম বললেন "সাবিত্রী, তুমি আর এসো না, নিবৃত্ত হও। তোমার শুদ্ধ ভাষা আর যুক্তি সম্মত বাক্য শুনে আমি তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর চাও। সত্যবানের জীবন ভিন্ন যা চাও তাই দেব। "সাবিত্রী বললেন," আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে বাস করছেন, আপনার প্রসাদে চক্ষু লাভ করে তিনি যেন অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হন।" যম বললেন, "তাই হবে। তোমাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখছি, তুমি ফিরে যাও।"

সাবিত্রী বললেন, " স্বামীর কাছে থাকলে আমার ক্লান্তি হবে কেন? তাঁর যে গতি আমারও সেই গতি। সজ্জনের সঙ্গে একবার মিলনও অতি বাঞ্ছনীয়, আর তাঁদের সঙ্গে মিত্রতার তো কথাই নেই। সাধুজনের সঙ্গে মিলন কখনও নিষ্ফল হয় না, সেজন্যে সর্ব্বদা সাধুসঙ্গেই থাকা উচিত।" যম বললেন, "তুমি যে হিতকর বাক্য বললে তা চিত্তকে আনন্দ দেয় আর বিদ্বানেরও প্রজ্ঞা বাড়ায়। সত্যবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় একটি বর চাও।

সাবিত্রী বললেন, "আমার শ্বশুর তাঁর রাজ্য পুনর্বার লাভ করুন, তিনি যেন স্বধর্ম্ম পালন করতে পারেন।"

যম বললেন, "রাজকন্যা তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এখন নিবৃত্ত হও, আর পরিশ্রম কোরো না।" সাবিত্রী বললেন, "দেব, আপনি জগতের লোককে নিয়মানুসারে সংযত রাখেন এবং আয়ুশেষে তাদের কর্মানুসারে নিয়ে যান, আপনার নিজের ইচ্ছায় নয়, এজন্যই আপনার নাম যম। আমার আর একটি কথা শুনুন। কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা কোনও প্রাণীর অনিষ্ট না করা, সকলকে ভালবাসা ও সকলের প্রতি সুবিচার করা – এই হল সাধুজনের নিত্য কর্ত্তব্য। এই পৃথিবীতে সবকিছুই আমার স্বামীর এই

দেহের মতই নশ্বর। জগতের লোক সাধারণত স্বল্পায়ু, দুর্ব্বল ও ভক্তিশূন্য। কিন্তু সাধুজনেরা শরণাগত শত্রুকেও দয়া করেন।" যম বললেন, "পিপাসিতের পক্ষে যেমন জল, সেইরকম তোমার বাক্য। কল্যাণী, তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর চাও।"

সাবিত্রী বললেন, "আমার পিতা পুত্রহীন, বংশরক্ষার্থ তাঁর যেন শতপুত্র হয়, এই তৃতীয় বর আমি চাচ্ছি।" যম বললেন, "তাই হবে। তুমি বহুদূরে এসে পড়েছ, এখন ফিরে যাও। সাবিত্রী বললেন, "আমার পক্ষে এ দূর নয়, কারণ স্বামীর নিকটই আছি। আমার মন আরও দূরে ধাবিত হচ্ছে। আপনি বিবস্বানের (সূর্য্যের) পুত্র, সেজন্যে আপনি বৈবস্বত; আপনি সমবুদ্ধিতে ধর্মানুসারে প্রজাশাসন করেন সেজন্যে আপনি ধর্মরাজ। আপনি সজ্জন, সজ্জনের উপর যেমন বিশ্বাস হয় তেমন বিশ্বাস নিজের উপরেও হয় না। সেজন্যে সকলেই সজ্জনের সঙ্গে মিত্রতা আকাঙ্খা করেন। একমাত্র হৃদয়ের শুদ্ধতার দ্বারাই সকল প্রাণীর বিশ্বাস অর্জ্জন করা যায়। সেইজন্যে সকলেই সজ্জনকে বিশ্বাস করেন।"

যম বললেন "তুমি যা বললে তেমন বাক্য আমি কোথাও শুনিনি। তোমার কথা শুনে আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করলাম। তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর চাও।" সাবিত্রী বললেন "আমার গর্ভে সত্যবানের ঔরসে যেন বলবীর্য্যশালী শতপুত্র হয় এই চতুর্থ বর চাচ্ছি।" যম বললেন "বলবীর্য্যশালী শতপুত্র তোমাকে আনন্দিত করবে। রাজকন্যা! দূর পথে এসেছ, ফিরে যাও।"

সাবিত্রী বললেন, "সাধুজন সর্ব্বদাই ধর্ম্মপথে থাকেন। ধার্ম্মিকের সঙ্গে ধার্ম্মিকের মিলন কখনও বৃথা হয় না। ধার্ম্মিকদের কাছ থেকে ধার্ম্মিকদের কোন বিপদও আসতে পারে না। সাধুরাই তাঁদের সততার দ্বারা সূর্য্যকে আকাশে পরিভ্রমণ করান। সজ্জনরা তাঁদের তপস্যার দ্বারাই পৃথিবীকে ধারণ করে থাকেন। হে যমরাজ, অতীত ও ভবিষ্যৎ দুইই কেবল সজ্জনদের উপরেই নির্ভর করে। তাই সজ্জনরা সজ্জনদের সঙ্গে থেকে কখনও অসুখী হন না। যাঁরা সজ্জন তাঁরা জানেন তাঁদের চিরকালের কর্ত্তব্য কি এবং তাঁরা সর্ব্বদাই পরের মঙ্গল করেন, প্রতিদানে কিছু আশা না করে। সজ্জনকে কোন ভাল কাজের ভার দিলে তিনি কখনও সেই সুযোগের অপব্যবহার করেন না। তাঁদের কাছে কারও প্রার্থনা বা সম্মান নষ্ট হয় না, তাঁরা সকলেরই রক্ষক"। যমরাজ বললেন, "যতই তোমার গভীর ব্যঞ্জনাময়, হৃদয়গ্রাহী বাক্য শুনছি ততই তোমার প্রতি আমার ভক্তি হচ্ছে। পতিব্রতা, তুমি এবার একটি

অতুলনীয় বর চাও।" তখন সাবিত্রী বললেন, "হে মানদ, যে বর আপনি আমাকে ইতিমধ্যেই দিয়েছেন তা ফলবান হবে না যদি না আমি আমার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারি। তাই অন্য সব বরের সঙ্গে আমি এটাও প্রার্থনা করি যে সত্যবান যেন তাঁর জীবন ফিরে পান। স্বামীকে ছাড়া আমি মৃততুল্য হয়ে আছি। স্বামীকে ছাড়া আমি সুখ চাই না, সমৃদ্ধি চাই না, স্বর্গ চাই না, বাঁচতেও চাই না। আপনি আমাকে শতপুত্রের বর দিয়েছেন, অথচ আমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যবান বেঁচে উঠুন্ এই বর চাইছি, কেননা তাতে আপনার বাক্য সত্য হবে।"

ধর্ম্মরাজ যম বললেন, "তাই হবে"। সত্যবানকে পাশমুক্ত করে যমরাজ হৃষ্টচিত্তে বললেন, "তোমার পতিকে মুক্তি দিলাম, ইনি নীরোগ, বলবান ও সফলকাম হবেন, চারশ বছর তোমার সঙ্গে জীবিত থাকবেন, যজ্ঞ ও ধর্মকার্য্য করে খ্যাতিলাভ করবেন।" যে তত্ত্বটি এই কাহিনীর মধ্যে আছে সেটি হল এই যে উপরের জগৎ থেকে যদি কোন বিশেষ কৃপা আমরা পাই তাহলে তার কাছে এই নশ্বর জগতের সব আইনকানুন ভন্ডুল হয়ে যাবে। সেইরকম, যদি গোলোকের সেবাধামে একটা স্থান আমরা পাই, তাহলে এই মর জগতে আর আমাদের আটকে রাখা যাবে না। যদি শ্রীমতী তুলসীদেবী সেই চিন্ময় জগতে আমাদের একটি স্থান দেন, তাহলে তাঁর কাছে আমরা এই নিরর্থক প্রার্থনা আর কেন করব যে, "যে মর্ত্ত্যভূমিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটা পরিস্কার করে দিন"? তা হল আত্ম-বঞ্চনা। তাই যাঁরা শ্রীভগবানের খুব উত্তম সেবক বা সেবিকা তাঁদের কাছে আমরা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে উত্তম সেবা অধিকার লাভ করার জন্যই প্রার্থনা করব। আমরা কোথায় আছি তা নিয়ে আমরা চিন্তা করব না, কারণ সে সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যাবে। যদি চিন্ময় ধামে একটি উত্তম সেবা অধিকার আমরা পাই, তবে নিশ্চয়ই এখানে আমাদের আর থাকতে হবে না। তাই শুদ্ধ ভক্ত তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে অন্য কিছুর জন্যে প্রার্থনা করবেন না, কারণ তাতে কেবল পন্ডশ্রম হবে। শুধু "আমার নিত্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অপ্রতিহত সেবা অধিকার পাওয়ার জন্যে শুদ্ধ বাসনা যেন আমার থাকে, এইটুকুই আমি চাই। এ ছাড়া আর কিছু আমি জানি না, এছাড়া আর কিছু আমি চাইও না।"

যিনি শুদ্ধভক্ত তিনি তাঁর হৃদয়ে যে শ্রীভগবান অধিষ্ঠিত আছেন তাঁর প্রাণপণ সেবা ছাড়া আর কিছুর জন্যে প্রার্থনা করেন না। তিনি কল্পনাও করতে পারেন না যে তাঁর নিজের স্বার্থের জন্যে তিনি কিছু চাইবেন। এই ধরণের আত্ম-ত্যাগের ধারণা খৃষ্টধর্ম্মেও রয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিস হল আত্ম-বিস্মৃতি। সেবক বা

সেবিকারা সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হয়ে শ্রীভগবানের আনন্দ বর্ধনের উদ্দেশ্যে আত্ম-নিমগ্ন হয়ে থাকেন। সেখানে কারোর কোন নিজের স্বার্থ নেই, সকলেই নিজের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ শ্রীভগবান যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম,— তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

তাই যিনি শুদ্ধভক্ত হবার বাসনা করেন, তিনি অন্য কিছু না চেয়ে তাঁর প্রাণনাথ, শ্রীভগবানকে আনন্দ দিতে চাইবেন, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা চাইবেন। যখন কেউ সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হয়ে যান এবং বলেন, ''যা হয় হোক্। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হোক্''- তখনই তুলসী দেবীর প্রতি তাঁর প্রার্থনা শুদ্ধভক্তি মিশ্রিত হয়। যদি কারোর সেইরকম উচ্চস্তরের সুকৃতি থাকে, শুদ্ধ ভক্তি থাকে, প্রেমভক্তির বীজ থাকে তাহলে তিনি কৃষ্ণের আনন্দ কিসে হবে তা ছাড়া আর কিছু চিন্তাই করতে পারেন না। তিনি তাঁর দেহমনের কথা বিস্মৃত হয়ে শ্রীভগবানের আনন্দ বর্ধনের চিন্তা করবেন, আর সেই হল সবচেয়ে বিশুদ্ধ প্রার্থনা।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মার যাত্রা ও পরম গন্তব্য

জীবাত্মার নিজের সুকৃতি অনুযায়ী, তার আভ্যন্তরীণ বিকাশ অনুযায়ী এবং যে কৃপা তার প্রতি উপর থেকে বর্ষিত হয়েছে সেই অনুযায়ী সে তার ভিতর আত্মার জাগরণকে অনুভব করবে। আত্মার সেই নবজাগরণ থেকে তার ভিতরে এক নতুন রুচি জেগে উঠবে এবং সেই রুচি অনুযায়ীই সে তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য বিধান করবে। তার এই ভিতরের রুচি থেকে তার মনে হবে, "এই বিশেষ ধরণের সেবা, এই বন্ধু ও শুভাকাঙ্খিগণ, এই সঙ্গ — এ যেন আমার খুব কাছের জিনিস, খুব নিজের জিনিস বলে মনে হচ্ছে। এসবই আমার খুব উপাদেয়, খুব মধুর বলে মনে হচ্ছে।"তার এই রুচি অনুযায়ী সে তার নিজের "খাদ্য" জোগাড় করে নেবে। যেমন পশু পাখীকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন তারা নিজেদের রুচি অনুযায়ী খাদ্য খুঁজে নেয়, তেমনি আত্মা যখন জেগে ওঠে সেও তার নিজের যথার্থ পরিবেশকে খুঁজে নেয়। তার ভিতরের রুচি পথ দেখিয়ে তাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে গিয়ে তার মনে হবে, "এ খুব মধুর, আমার হৃদয়কে এ এমনভাবে আকর্ষণ করছে যে তার কাছে আমি অসহায় হয়ে গেছি, নিজেকে বশে রাখবার ক্ষমতা আর আমার নেই, এমনই আকর্ষণ আমার এর প্রতি!" এইভাবে সে তার পথের নির্দ্দেশ পাবে। তার ভিতর থেকে কোন স্বতঃলব্ধ জ্ঞান বা প্রবৃত্তি তাকে পথ দেখাবে। যেমন এই জগতে জীবের কোন স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবৃত্তি আছে, তেমনি চিন্ময় জীবনের ভূমিতেও স্বতঃস্ফূর্ত্তজ্ঞান বা প্রবৃত্তিআছে — সে হল আত্মার অনাবিষ্কৃত প্রবৃত্তি। সেই নবজাগরিত প্রবৃত্তিই স্থির করবে কোন বস্তুটা আত্মা গ্রহণ করবে আর কোনটা সে বর্জ্জন করবে। যেমন আমরা আমাদের সাধনার পথে অগ্রসর হবো তেমন আমাদের নতুন উপলব্ধি আসবে এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমরা আরও অনেক জিনিসকে গ্রহণ করবো, আরও অনেক জিনিসকে বর্জ্জন করবো। ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমরা উন্নতির পথে এগিয়ে যাবো।

পাশ্চাত্যের নানা দেশ থেকে এসে আপনারা কেন এই কৃষ্ণভাবনামৃতকে, এই ভাগবত ধর্ম্মকে গ্রহণ করেছেন.? আপনাদের মধ্যে বেশীর ভাগই খৃষ্টধর্ম্মের অনুসরণকারী ছিলেন, তবে কেন এই ভাগবত ধর্ম্ম আপনাদের হৃদয়কে, আত্মাকে আকর্ষণ করল? কিছু একটা আধ্যাত্মিক ধারণা আপনাদের নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সেটা

আপনারা ত্যাগ করলেন কেন? কেন আপনারা নিজেদের ঐতিহ্য এবং সেই ঐতিহ্যের অন্তগর্ত বন্ধু বান্ধবের দলকে ত্যাগ করলেন? কেন সেসব ছেড়ে আপনারা এসেছেন এই ভাগবতধর্ম্মকে গ্রহণ করতে? কেন আপনারা এত বড় ঝুঁকি নিলেন? নিজেদের দেশ, সমাজ, ধর্ম্মকে পিছনে ফেলে রেখে আপনারা এই ভাগবত ধর্ম্মের দিকে এগিয়ে এসেছেন এবং শুধু তাই নয়, এই ধর্ম্ম আবার প্রাণপণে প্রচারও করছেন। এই ভিতরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবৃত্তিই আবার আপনাদের ভাগবত ধর্ম্মের সেবায় নতুন নতুন দিকে নিয়ে যাবে।

আমাদের ভিতর যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবৃত্তি আছে, যে রুচি ও ব্যাকুলতা আছে তাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। যখন মনে হবে, "এই সেবা আমার বড় আনন্দের জিনিস, এই সেবা আমাকে পেতেই হবে," তখন হৃদয়ের সেই আকর্ষণই আমাদের পথ প্রদর্শক হবে। অন্তরে যে চৈত্য গুরু আছেন, যে রাজাধিরাজ আছেন, তাঁর অনুগত্যই আমাদের পথপ্রদর্শন করবে। যখন ভিতরে যে সার্ব্বভৌম গুরু আছেন তাঁর আদেশ আমরা শুনতে পাই না, তখন বাইরে যে মহান্ত গুরু আছেন তাঁর থেকে ও শাস্ত্র থেকে আমাদের অবশ্যই উপদেশ ও নির্দ্দেশ নিতে হবে। আমাদের চলার পথে সর্ব্বদাই আমাদের উপদেশ ও নির্দ্দেশ প্রয়োজন। তারপর আমরা এমন এক স্তরে উপনীত হবো যেখানে আমাদের রুচি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের ভিতরের এই পথপ্রদর্শকের নির্দ্দেশই আমাদের কোন স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত করবে, যেমন পশুপাখীরা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়।

ভক্তিলতার চারপাশে আগাছা

জনৈক ভক্ত ঃ তাহলে গুরুমহারাজ, এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করছি। কেন পাশ্চত্যের ভক্তরা কেউ কেউ আবার, যে কোন কারণেই হোক, এই কৃষ্ণভক্তির সঙ্গ ছেড়ে চলে গেছেন?

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ ঃ সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে এটা বোঝা যায় যে এইরকম অনন্য আত্মনিবেদনের জীবনকে গ্রহণ করা খুব সহজ জিনিস নয়। কত রকমের বাধা আছে এই পথে, পূর্ব্বজীবনের প্রবৃত্তিও আবার ফিরে আসতে পারে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার করে আমরা কর্ম্ম, চিন্তা ও বাক্য দ্বারা নানা অপরাধও করতে পারি। এই স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে নানা ছিদ্র আছে, এটা একটা পরিপূর্ণ নিখুঁত জিনিস নয়। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা খুব দুর্ব্বল ও সীমিত। সাধনার পথে থাকা মানে অনবরত ভক্তি-প্রতিকূল বিষয়কে বর্জ্জন করা আর নতুন নতুন ভক্তির -- অনুকূল বিষয়কে গ্রহণ করা। কিন্তু সেই পদ্ধতির মধ্যেও কত বাধা-বিপত্তি আসতে পারে আমাদের

পূর্ব্বজীবনের অভ্যাস ও প্রবৃত্তি থেকে, যা আমাদের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে। যদিও আমি মনে মনে জানি যে এখানে আমি যা দেখছি তা এক উচ্চতর সেবা, তবুও আমার পূর্ব্বেকার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি আমাকে এই সেবা অধিকার গ্রহণ করতে দেবে না। এই সেবার জীবনকে গ্রহণ করার জন্যে যে তপস্যা ও কৃচ্ছসাধনের প্রয়োজন, যে সাহস ও সঙ্কল্পের প্রয়োজন, আমার পূর্বজীবনের অভ্যাস ও প্রবৃত্তি আমাকে তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কতরকমের বাধা-ই চারিদিকে রয়েছে। যেমন চারাগাছের চারপাশে আগাছা জন্মায়, তেমনি এই ভক্তি লতার চারপাশেও আগাছা জন্মায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃততে এর বর্ণনা আছে।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।

চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা ১৯।১৫১)

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা।।
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ।।
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি, যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়।।

চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা ১৯।১৫৮-১৬০)

সমস্ত জীব নিজের কর্ম্ম অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডের নানা জায়গায় নানা দেহে ভ্রমণ করছেন অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন। কেউ বা নিজের কর্ম্মফলে স্বর্গে যাচ্ছেন, কেউ মর্ত্ত্যে আসছেন, কেউ নরকে যাচ্ছেন। এইরকম বহু লক্ষ কোটি জীবের মধ্যে কোন সৌভাগ্যবান জীব নিজের সুকৃতির ফলে, গুরু ও কৃষ্ণের প্রসাদে ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্ত হন, কৃষ্ণভক্তির বীজ তাঁর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়।

এই ভক্তিলতার চারপাশে আগাছাও জন্মাতে পারে। এই প্রকৃত ভক্তিলতার নিজের শাখা ছাড়াও ঠিক ঐ একই আকৃতি বিশিষ্ট অন্য লতার শাখা এই প্রকৃত লতাকে জড়িয়ে উঠতে থাকে, যাকে সাধারণ দৃষ্টিতে তারই 'অঙ্গ' বলে মনে হয়। কিন্তু এই আগাছা প্রকৃত লতার অঙ্গ নয়। নিষিদ্ধ আচার, জীবহিংসা, কুটিলতা, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার বাসনা এই সবই হল আগাছা বা উপশাখা।

ভক্তিলতা প্রথমে একটি ছোট্ট চারা হয়ে জন্মায়, তারপর ক্রমশঃ তা বড় হতে

থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এখানে বলেছেন যে, এই 'মূল শাখা' ভক্তিলতার সঙ্গে নানা আগাছাও বেড়ে ওঠে। যখন ভক্তিলতা তার জল ও খাদ্য পায় তখন অন্য আগাছারাও সেই জল ও খাদ্য পেয়ে বেড়ে ওঠে। সাধক যখন 'লাভ' এবং 'পূজা' (বা সম্মান) – এই দুটি জিনিস প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর ভিতরে, অর্থাৎ তাঁর আভ্যন্তরীণ জগতে আরও শত্রুর সৃষ্টি হতে পারে। তাঁর পূর্ব্বেকার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী নতুন শত্রুরা তাঁর ভিতরে আসতে পারে। হয়ত নিজের স্বার্থের জন্য টাকা সংগ্রহ করার ইচ্ছা বা নারীর (বা পুরুষের) ভালবাসা পাওয়ার ইচ্ছা, এসব তাঁর ভিতরে আসতে পারে। তারপর তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্যে, অর্থাৎ যশ ও জনপ্রিয়তার জন্যে বাসনা জাগতে পারে। কত জিনিস-ই তাঁর পথে আসতে পারে। কেউ যখন উপরে ওঠার চেষ্টা করে তখন তার পথে অনেক বাধা আসে তাকে আটকাবার জন্যে। কিন্তু আমাদের খুব সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হবে এইসব জিনিস থেকে দূরে থাকার জন্যে। বহু বাধাই আসবে এবং আমাদের দিব্য প্রেরণার যেসব শত্রু অন্তর্জ্জগৎ থেকে এসেছে তাদের হাত থেকে আমরা নিজেদের বাঁচাতে পারি, সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে। এর উপর যদি আমাদের নিজেদের আন্তরিকতা থাকে, তাহলে আমরা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করব।

প্রগতির পথে প্রত্যেক নতুন স্তরে যখন আমরা উপনীত হবো, তখন সেখানে আবার নতুন বাধা আসবে। সুতরাং আত্মার এই বিবর্ত্তনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ বা ফুল বিছানো নয়, এ খুব কঠিন পথ। যতই আমরা লক্ষ্যের দিকে পৌঁছব, ততই আমরা এসব বাধামুক্ত হবো। কিন্তু প্রথমদিকে নানারকমের বাধা আমাদের আটকাতে আসবে। আমাদের পূর্বেকার কর্ম্মফলও আমাদের কাছে ফিরে আসবে, সেই ফলও আমাদের আস্বাদন করতে হবে। পূর্বেকার নানা প্রবৃত্তিও আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করবে আমাদের তাদের এলাকায় রাখার জন্যে। কিন্তু যতই আমরা এইসব বাধার সম্মুখীন হবো, তাদের অতিক্রম করে যাবো, তাদের জয় করব, ততই আমরা উচ্চতর সাধনার ভূমিতে উপনীত হবো, আর বাধাগুলি একে একে পিছু হটবে। তবুও কিছু একটা হয়ত থেকেই যাবে, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠার বাসনা।

শ্রীমান্ মহাপ্রভু এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাঁর শিক্ষাষ্টকম্-এ বলেছেন,

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

এই শ্লোকের মধ্যে যে ভাবটি রয়েছে তা যদি ভক্তি পথে চলতে গিয়ে আমরা মনে

রাখি, তাহলে আমাদের পথে বাধা অনেক কম আসবে। 'তৃণাদপি সুনীচেন' – নিজেকে যেন আমরা তৃণের চেয়েও অধম বা দীন বলে মনে করতে পারি। অপরের সঙ্গে যথার্থ ব্যবহারের জন্যে সর্বপ্রথম যে ভাবটি আমাদের মনে রাখা উচিত, সেটি হল এই যে আমি যেন তৃণের মত দীনহীন হয়ে থাকতে পারি। আমি নিজেকে আমার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হওয়ার কোন কারণ হতে দেব না। দ্বিতীয়তঃ "তরোরিব সহিষ্ণুনা" – অর্থাৎ আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে হবে। কারণ দীনহীন হয়ে থাকলেও হয়ত পারিপার্শ্বিক থেকে আমাদের প্রতি কোন আক্রমণ আসতে পারে। তখন তার সঙ্গে যুদ্ধ না করে তাকে আমাদের নীরবে সহ্য করতে হবে। তারপর তৃতীয়তঃ হল, "অমানিনা মানদেন" অর্থাৎ পরের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার জন্যে আমি কোন চেষ্টা করব না। জনপ্রিয় হবার জন্যে বা নিজের নাম যশের জন্যে যেন আমার কোন আকাঙ্খা না থাকে। কিন্তু সেই একই সঙ্গে আমার পারিপার্শ্বিককে এবং সেই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সবাইকে আমি যথাযথ সম্মান দেবো। অপরকে আমি সর্ব্বদাই সম্মান করব, কিন্তু অপরের কাছ থেকে নিজের জন্যে কোন সম্মান আশা করব না। আমাদের চলার পথে যতই আমরা মনের মধ্যে এইরকমের চিন্তা নিয়ে চলবো এবং সেইরকম ব্যবহারও করব, ততই আমাদের কম বাধার সম্মুখীন হতে হবে।

যাঁরা কোন মঠে একজন উত্তম বৈষ্ণবের আনুগত্যে আছেন তাঁরাও নানা বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন। যখন আমরা মঠের বাইরে প্রচার করতে যাব তখন আমাদের নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। যাঁরা ভ্রান্ত ধারণা, ভুল তথ্য প্রচার করছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের বাক্‌যুদ্ধ করতে হবে, উত্তম বৈষ্ণবের সাহায্য নিয়ে। আমরা আমাদের প্রচারের দ্বারা তাঁদের ভুল দেখিয়ে তাঁদের পরাজিত বা বশীভূত করতে পারি, অথবা তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে পারি উত্তম বৈষ্ণবের দর্শন করার জন্যে। এইভাবে আমরা মায়ার শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি ও প্রতি আক্রমণ চালাতে পারি। এই সময় আমরা ঐ চিন্তাধারা অবলম্বন করব না যে, "পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি করার কোন কারণ আমি হবো না।" যখন আমরা প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত হব, তখন আমরা "সৈনিকের" মত, তখন আমরা বিরুদ্ধপক্ষের সম্মুখীন হবো এবং তাকে "নিরস্ত্র" করার চেষ্টা করব। আর তা যদি না করতে পারি তাহলে তাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো শ্রীগুরুদেবের দর্শনের জন্যে, যাতে তিনি তাকে "নিরস্ত্র" করতে পারেন।

এইভাবে আমি আমার কাজ চালিয়ে যাবো, বৈষ্ণবের আদেশ পালন করে।

আর যদি তা করতে গিয়ে কোনভাবে পারিপার্শ্বিক থেকে আমি "আহত" হই তবে তাতে আমার আধ্যাত্মিক শক্তি আরও বেড়ে যাবে, কারণ আমি যা করছি তা উপর থেকে আদেশ পেয়েই করছি; এ আমার বৈষ্ণব-সেবা। এর থেকে আমার প্রচুর কল্যাণ হবে।

আমার যেন এই মনোভাব হয়, যে যদি প্রতিষ্ঠা পেতে হয় তাহলে আমি কেবল 'বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা' চাই। সাধারণ জনগণের কাছে জনপ্রিয় আমি হতে চাই না,– তারা তো প্রায় উন্মত্তের মত! কিন্তু আমার প্রভু, আমার গুরুদেবের কাছে, যেন আমি একটা স্থান পাই। তিনি যেন মনে করেন যে, "হ্যাঁ, এই ছেলেটি বা এই মেয়েটির মধ্যে কিছু সম্ভাবনা আছে। কৃষ্ণভক্তির পথে এ এগিয়ে যেতে পারবে। **"যখন আমার বৈকুণ্ঠের অভিভাবকরা আমার প্রতি একটু স্নেহ ও উৎসাহ নিয়ে দৃষ্টিপাত করবেন, তখন সেই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় মূলধন।"** যদি আমার প্রতি তাঁরা একটু সন্তুষ্ট হন, তাহলে তাঁদের আশীর্ব্বাদ, শুভাকাঙ্খা ও স্নেহকে সম্বল করেই আমি সেই চিন্ময় জগতের দিকে এগোতে পারব।

যদি আমরা কোন নির্জ্জন জায়গায় একলা থেকে শ্রীনাম জপ করি তাহলে নিশ্চয়ই "তৃণাদপি সুনীচেন" – এই উপদেশ আমাদের সর্ব্বদা পালন করতে হবে। **কিন্তু যখন আমরা কোন "সেনাপতি"র আনুগত্যে থেকে প্রচারকার্য্য বা "যুদ্ধ" চালাচ্ছি, তখন আমাদের বাইরের রূপ একটু অন্যরকম হবে। তখন ঐ উত্তম বৈষ্ণব বা আধ্যাত্মিক 'সেনাপতি'র আদেশ পালন করার জন্যে আমাদের বাহ্যিক রূপ একটু পালটাতে হবে। তাতেই বেশী কাজ হবে।**

বৈষ্ণব সন্ন্যাসের তাৎপর্য্য

জনৈক ভক্ত: যখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু সব ভক্তদেরই নির্ব্বিশেষে আদেশ দিয়ে দিয়েছেন সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ ও প্রচারকার্য্য চালিয়ে যাওয়ার জন্যে, তখন আমাদের সম্প্রদায়ে যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমে আছেন, তাঁদের বিশেষ ভূমিকাটা কি? বিশেষ করে যখন শাস্ত্রে একথাও বলেছেন যে কলিযুগে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ?

শ্রীল শ্রীধর মহারাজঃ এর উত্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে ব্যাখা করা হয়েছে। এটা শুধু গৌড়ীয় সম্প্রদায়েরই প্রশ্ন নয়, যাঁরা রামানুজ বা মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ে রয়েছেন, এমনকি যাঁরা শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ে আছেন তাঁদেরও প্রশ্ন। বৌদ্ধ মতাবলম্বীরা পুরাণের নির্দ্দেশ মানতে না পারেন। কিন্তু যাঁরা শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ে আছেন ও যাঁরা

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আছেন তাঁরাও পুরাণের নির্দ্দেশ মানেন ও সন্ন্যাসও গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্য নিজে সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরাও বেশীর ভাগই সন্ন্যাসী ছিলেন। রামানুজ, মধ্বাচার্য্য ও বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় সম্বন্ধেও একথা সত্য। এ সম্বন্ধে যে ব্যাখা দেওয়া হয়েছে তা হল এই যে, কলিযুগে সনাতন সন্ন্যাস, যাকে যর্থাথ অর্থে কর্ম্ম-সন্ন্যাস বলা হয় তা নিষিদ্ধ। কর্ম্ম সন্ন্যাসের অর্থ হল এই যে যিনি সন্ন্যাস নেবেন তিনি সবকিছুই ত্যাগ করবেন। কিন্তু এই রকম সন্ন্যাস কলিযুগে সম্ভব নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সত্যযুগে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের অস্থি বা হাড়ের অস্তিত্ব থাকত, ততক্ষণ সে বেঁচে থাকত। হাড়ের আয়ু পর্য্যন্তই মানুষের আয়ু ছিল। তারপর ত্রেতাযুগে যতক্ষণ মানুষের স্নায়ু বজায় থাকত ততক্ষণ সে বেঁচে থাকত। কিন্তু কলিযুগের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে কলির জীব হল "অন্নগত প্রাণ।" মানুষের আয়ু এখন খাদ্যের উপর নির্ভর করে। তাই যথার্থ অর্থে সন্ন্যাস কলিযুগে সম্ভব নয়।

পূর্ব্বকালে বাল্মিকী এমন ঘোর তপস্যা করেছিলেন বহু বছর ধরে যে উইপোকা তাঁর সমস্ত শরীর খেয়ে ফেলে তাঁর রক্তমাংসকে মাটির ঢিবিতে পরিণত করেছিল। তবুও তিনি তাঁর কঙ্কাল বা হাড়ের মধ্যে বেঁচে ছিলেন। তারপর দৈবী কৃপায় তাঁর সমস্ত শরীর আবার তিনি ফিরে পান। কিন্তু কলিযুগে খাদ্য ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। সমস্ত রকমের তপস্যা, কৃচ্ছসাধন ও প্রায়শ্চিত্ত কলিযুগের জন্যে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। যে একটানা উপবাসের নির্দ্দেশ কলিযুগে দেওয়া হয়েছে, তা মাত্র চব্বিশ ঘন্টার জন্যে, তার চেয়ে বেশী নয়। অন্য সব যুগে অন্ততঃ বারোদিনের উপবাস সাধারণতঃ করা হত। কেউ কোন অপরাধ বা পাপ করলে স্মৃতি শাস্ত্র অনুযায়ী তার সাধারণ দণ্ড ছিল বারোদিনের উপবাস। কিন্তু কলিযুগে চব্বিশ ঘন্টার উপবাসই যথেষ্ট, কারণ খাদ্য ছাড়া এখন মানুষ বাঁচতে পারে না।

যিনি জাগতিক আদান- প্রদানের উপর এত নির্ভরশীল, তিনি যদি কর্ম্ম-সন্ন্যাস নেন, তাহলে তো তিনি বাঁচতেই পারবেন না। কিন্তু বৈষ্ণব ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের যে জীবন তা এরকম চরমপন্থী নয়। ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের জীবনে প্রসাদ গ্রহণ ও সেবার নির্দ্দেশ আছে। অতএব তা 'যুক্তাহারো বিহারশ্চ' এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে একটি মধ্যপন্থী সন্ন্যাস। এই পদ্ধতি যিনি অবলম্বন করেছেন তিনি সন্ন্যাস নিতে পারেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রমুখ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারাও সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। এই সন্ন্যাস কর্ম্ম-সন্ন্যাস বলে বর্ণিত হয়েছে। তবু একথা সত্য যে সন্ন্যাস বহু প্রকারের। বিদ্যুৎ-সন্ন্যাস বলেও একধরণের

সন্ন্যাস আছে, যাকে মোক্ষবাদীরা সর্ব্বোচ্চ পন্থা বলে মনে করেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হল এই যে, যখন কোন জীবাত্মা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবেন যে এই জড়জগতের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগ আছে তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন, তখন তিনি এই জড়জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়ে আত্মিক জগতে প্রবেশ করবেন। যখন তিনি এই দৃঢ় চেতনার উপর সম্পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হবেন যে "এই জড় জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শুধু আমার ক্ষতিই করবে" তখন তিনি এই দেহকে ত্যাগ করে চলে যাবেন পরব্যোমের দিকে। এই হল বিদ্বৎ-সন্ন্যাস।

তারপর নরোত্তম-সন্ন্যাসও আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে —

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্যা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ।।

(শ্রীমদ্‌ভাগবত ১।১৩।২৭)

অর্থাৎ যিনি জাগ্রত হয়েছেন এবং তাঁর নিজের বা পরের সাহায্যে এই উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন যে এই জড়জগৎ নশ্বর ও দুঃখপূর্ণ এবং সেজন্যে তিনি তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত শ্রীহরির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে গৃহত্যাগ করে চলে যান, তিনিই হলেন নরোত্তম। এই "নরোত্তম সন্ন্যাস" পদ্ধতিতে যিনি সন্ন্যাস নেবেন, তিনি তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত শ্রীভগবানের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে তাঁর বর্ত্তমান জীবনযাত্রা ও গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করে চলে যাবেন। সন্ন্যাস নিয়ে তিনি যেখানে সেখানে থাকবেন, কখনও হয়ত গাছের নীচে, কখনও গুহার মধ্যে, যেখানে পারবেন সেখানেই তিনি থাকবেন, তাঁর শরীরের কথা চিন্তা না করে। তিনি তৎক্ষণাৎ-ই দেহত্যাগ করেন না। যখন যেখানে যেমন খাদ্য পান তাই খান, যখন কোন খাদ্য পান না তখন উপবাস করেন, এইভাবে তাঁর দিন কাটে। তাঁর গার্হস্থ্য আশ্রমকে তিনি চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে যান। এই হল 'নরোত্তম সন্ন্যাস'।

তারপর শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সন্ন্যাসের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর আছে, যেমন কুটিচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। সন্ন্যাসের উত্তরোত্তর এইসব স্তর আছে। কিন্তু ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রথায় যিনি সন্ন্যাস নেন তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন এবং শ্রীভগবানের বাণী প্রচার করেন — সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য। এই সন্ন্যাসের এই হল বৈশিষ্ট্য এবং সেইজন্যই এ অন্য সব সন্ন্যাস থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এই জড়জগতের সমস্ত প্রলোভনে বিতৃষ্ণ হয়ে এই জড়জগতকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার মনোভাব ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী কখনও নেন না।

বরং তিনি কোন উত্তম বৈষ্ণবের আনুগত্যে থেকে উপরের জগতের কোন উচ্চতর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, তাই তাঁর দেহধারণের প্রয়োজন আছে। এই জড়জগতে থেকে, এখানকার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই তিনি সেই চিন্ময় জগতের মঙ্গলময় শক্তিকে এখানে আকর্ষণ করেন এবং সেই মঙ্গলময় শক্তিকে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিতরণ করেন। এ হল অন্য এক ধরণের সন্ন্যাসের তত্ত্ব এবং এর এক বিশেষ অবদান বা মূল্য আছে।

শ্রীভগবানের ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় পার্ষদরা তাঁর যে ধরণের সেবায় নিযুক্ত আছেন এ হল সেই ধরণের সেবা। যখন শ্রীভগবান অবতার হয়ে আসেন তখন তিনি তাঁর প্রিয় পার্ষদ, প্রিয় বন্ধু ও সেবকদেরও এখানে পাঠান, তাঁকে সেবা করার জন্যে, তাঁকে সাহায্য করার জন্যে। তাঁদের নীচেও তাঁদের প্রতিনিধিরা আছেন যাঁরা এই উচ্চতর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কোন বিশেষ সেবা প্রাপ্ত হয়েছেন। যাঁরা এই পৃথিবীর যোগাযোগ ছিন্ন করে চলে যেতে খুব উদগ্রীব, তাঁদের চেয়ে যাঁরা এই জগতের মধ্যে থেকে, এই উচ্চতর সেবায় নিয়োজিত থেকে, সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যে এখানে পরিভ্রমণ করেন, তাঁরা অনেক বেশি আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্জ্জন করেন। তাঁরা এই জগতের সঙ্গে তাঁদের যে যোগযোগ আছে তাকে কাজে লাগিয়েই চিন্ময় জগতের অমূল্য সম্পদ অর্জ্জন করেন। তাই শ্রীভগবানের প্রিয় পার্ষদদের মত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরাও এ জগতে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন।

নারীর দিব্য মহিমা

জনৈক ভক্ত: মহারাজ, আমরা জানি শাস্ত্রে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যেসব পুরুষ ভক্তরা আমাদের গুরুভগিনীদের সঙ্গে একসঙ্গে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের সেবায় নিয়োজিত আছি— তাঁদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হওয়া উচিত?

শ্রীল শ্রীধর মহারাজঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুযায়ী, সাধারণতঃ শূদ্র ও মহিলাদের উচ্চতর ধার্ম্মিক ক্রিয়াকলাপে প্রত্যক্ষ অংশ নিতে দেওয়া হয় না। তাঁরা শুধু পরোক্ষভাবে অংশ নিতে পারেন এবং তাঁরা উপবীত ধারণ করতে পারেন না। তবুও দেখা গেছে ব্রাহ্মণের ছেলেও তার মার চরণস্পর্শ করে মাকে প্রণাম করে। তার মা হয়ত নারায়ণের বিগ্রহকে স্পর্শ করবেন না, কিন্তু যে ছেলে সেই নারায়ণের বিগ্রহের পূজারী, সেও তার মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় ছুঁইয়ে মাকে প্রণাম করে! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মধ্যেও নারীকে এই আসন দেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে শ্রীবিগ্রহের সেবায়

সাধারণতঃ মেয়েদের অযোগ্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মে ঐরকমের বিধিনিষেধের কড়াকড়ি নেই।

অল্প বয়সে আমার মনের মধ্যে মহিলাদের সম্বন্ধে একটা মর্য্যাদাহীন ভাব জেগে উঠেছিল। আমি মনে করতাম আমার তাঁদের কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত যেন তাঁরা অস্পৃশ্য! কিন্তু আমার সেই মনোভাব আমার জ্যেঠিমা পালটে দিয়েছিলেন। আমার স্বভাব ও ব্যবহার তিনি লক্ষ্য করে ছিলেন, তারপর একদিন তিনি আমাকে ডেকে খুব স্নেহের সঙ্গে বললেন, "তুমি কি জানন যে মেয়েরা লক্ষ্মীদেবীর প্রতিনিধি? তাঁরা সেই লক্ষ্মীদেবীর গুণগত দিকেরই অর্ন্তগত এবং তাঁদের মধ্যে আত্ম-ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের ভাবটি খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সেইজন্যে তাঁদের সম্মান করা উচিত। আর পুরুষরা, যারা পরকে তাদের ক্ষমতাধীন রাখতে চায় তাদের সম্বন্ধেই তোমার বিরূপ ধারণা পোষণ করা উচিত। মেয়েদের মধ্যে যে আত্ম-সচেতনতা আছে তার মধ্যে খুব মহৎ আদর্শ আছে এবং সেখানে আত্ম-ত্যাগ ও ভক্তির ভাবটি খুব স্পষ্ট দেখা যায়। মেয়েরা ক্ষমতালোভী বা আক্রমণকারী নয়, তাঁরা আত্ম-ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি। পুরুষ স্বভাবের মধ্যেই এই দমনকারী ভাবটি রয়েছে।"

ক্রমশঃ এই ধারণাটা আমার মনে এল এবং আমি সীতা, দ্রৌপদী ও আরও অনেক নারীর মহিমা উপলব্ধি করলাম। বিশেষ করে গোপীরা নারীত্বের যে পরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা আমার হৃদয়কে খুব আকর্ষণ করল। নারীত্বের যে চরম মহিমা, সেই আত্ম বিস্মৃতি, আত্ম ত্যাগ ও আত্ম নিবেদনের ভাবটি তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে গোপীদের মধ্যেই। এই দীন, নম্র ভাবের স্থানই সর্ব্বোচ্চ — এই ধারণাটা ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমার মনে এল এবং এতে আমার মনের মধ্যে একটা সম্পূর্ণতা ও পরিবর্ত্তন এল।

মধুর রসের স্থানই সর্ব্বোচ্চ আর শ্রীমতী রাধারাণীর মধ্যেই আমরা প্রেম ও আত্মত্যাগের পরম পরাকাষ্ঠা দেখি।

পুরুষের মধ্যে একটা দমন করার, ক্ষমতা পাওয়ার, প্রবৃত্তি আছে তাই তারাই মূলতঃ এ জগতের সব সঙ্ঘর্ষের জন্য দায়ী। আমাদের পুরুষদের মধ্যে এই যে আক্রমণ করার বা দমন করার প্রবৃত্তি আছে — এটা আমাদের একটা রোগ। ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমার ভিতরে এই ধারণাটা বিকশিত হল এবং চরমে আমি দেখলাম যে নারী প্রকৃতিই শুদ্ধ। বৃন্দাবনে, শ্রীভগবানের সর্ব্বোচ্চ ধামের যে সর্ব্বোচ্চ লীলা, সেখানে

বাৎসল্য রস ও মধুর রসের স্থানই সর্ব্বোচ্চ। আর আমাদের চরম প্রার্থনা হল শ্রীমতী রাধারাণীর সেবা অধিকার পাওয়ার জন্যে।

শ্রীমতী রাধারাণীর আসন হল সর্ব্বোচ্চ, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোচ্চ সেবা অধিকার পেয়েছেন। আর শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাধাদাস্যকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। বাসুদেব ঘোষ তাই বলেছেন,—

(যদি) গৌর না হ'ত তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে ।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত' কে?

এই মধুর, নিগূঢ়, চিন্ময় সত্যকে এই জগতে কে প্রকাশ করতেন — যদি গৌরাঙ্গ স্বয়ং এই পৃথিবীতে না অবতীর্ণ হতেন? কে আমাদের জানাত যে রাধাদাস্যই সর্ব্বোচ্চ সেবা? কিন্তু গৌরাঙ্গ এসেছিলেন এবং তিনি খুব পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে সর্ব্বোত্তমা সেবিকার সেবাই সর্ব্বোচ্চ সেবা। সেই সর্ব্বোত্তমা সেবিকা হলেন শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি, তাঁর আত্মনিবেদিতা শক্তি — শ্রীমতী রাধারাণী।

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম, একোয়াডর

ARUNIMA PRINTING WORKS, CALCUTTA. PHONE 241 1006